আরও আলো

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

প্রীতিভাজনেষু

বলা বাহুল্য যে এই কাহিনীর চরিত্র সবই কাল্পনিক। সিমলা কালীবাড়ির সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

গ্রন্থকার

১২০, অফিসার্স কলোনি,
কাঁচরাপাড়া।

এই লেখকের

রূপম্‌?

একটি আশ্বাস

মণিপদ্ম

সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত

অয়ি অবন্ধনে

জনম জনম

তুঙ্গভদ্রা

কী মায়া

আয় চাঁদ

রমাণি বীক্ষ্য :

১. দক্ষিণ ভারত পর্ব

২. দ্রাবিড় পর্ব

৩. কালিন্দী পর্ব

৪. রাজস্থান পর্ব

সৌরাষ্ট্র পর্ব

এক

সিমলায় প্রাণসঞ্চার হচ্ছে।

শীতের সময় পাহাড়ের সহরগুলো যেন মরে থাকে। নির্জীব নিরানন্দ। তারপর উপরের পাহাড়ে বরফ পড়া বন্ধ হয়, পায়ের নিচের হিম তাড়াতাড়ি শুকিয়ে উঠে। রৌদ্র প্রখর হয়। পাহাড় জাগে।

মাত্র কয়েকটা মাসের জাগরণ। বর্ষার সময়ে আবার ঝিমিয়ে যায়। তারপর আসে দুর্গাপুজো। সিমলার বাঙালী মহলে সেই তো সত্যিকার প্রাণসঞ্চার। আগ্রহে সবাই থাকে এই সময়ের অপেক্ষা করে।

ঝাউএর গাছে গাছে বীচির ফলগুলো তখন পেকে শুকিয়ে গেছে। হাওয়ায় ফেটে গিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছে। এমনি ছড়িয়ে-পড়া বীচি থেকে নূতন চারা গজাবে। পাহাড়ে বনে গাছের চারা তো কেউ লাগায় না। এই রকম করেই তারা সৃষ্টিকে সাহায্য করছে অনাদিকাল থেকে। শুধু গাছ কেন, মানুষ পশুপাখি সবাই প্রকৃতিকে সাহায্য করে। প্রকৃতির প্রয়োজনে হয়তো করেনা, করে নিজেরই প্রয়োজনে।

সেদিন হরিহরবাবু একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন কালীবাড়ির অফিস ঘরে বসেঃ আজকের মানুষ কি প্রকৃতিকে সাহায্য করছে, না তার ক্ষতি করছে গায়ে পড়ে ?

সনাতন গোস্বামী উপস্থিত ছিল। বিস্ময় প্রকাশ করে বললঃ সেকি বাঁড়ুয্যে মশায়, প্রকৃতির আবার কেউ ক্ষতি করতে পারে নাকি ?

সনাতনের কথায় এমন একটা ভাব আছে যে তার গম্ভীর কথাকেও সহসা তামাসা বলে মনে হয়। হরিহরবাবুরও বোধহয় তাই মনে হল। অবসরপ্রাপ্ত কোন বৃদ্ধের সঙ্গে সনাতনের মতো অর্বাচীন ছোকরা রসিকতা করবে, এ তাঁর সহ্যের সীমার বাইরে। কিন্তু সংযম অপরিসীম বলে নিরুত্তর রইলেন।

ব্যাপারটা সনাতন বুঝতে পেরেছিল। বলল: সত্যি সত্যিই আমি জানতে চাইছি বাঁড়ুয্যে মশাই। কথাটা ভাববার মতো কিনা।

হরিহরবাবু একবার সনাতনের আপাদমস্তক দেখলেন। কিন্তু কথা কইলেন না। সম্পাদক মশায় মাথা নিচু করে কাজ করছিলেন। বললেন: কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ হরিহর, আমরা শুধু মানুষের নয়, প্রকৃতিরও ক্ষতি করছি।

সনাতনকে উপেক্ষা করে হরিহরবাবু বললেন: এই যে পুজো আসছে, এই পূজো কি সমাজের কম ক্ষতি করে!

এবারে সম্পাদক মশায় নিজেও চমকে উঠলেন, বললেন: বলকি, দুর্গাপূজো সমাজের ক্ষতি করবে?

গম্ভীরভাবে হরিহবাবু বললেন: কলকাতায় দুর্গাপূজোর গল্প শুনেছি। দুএকটা বনেদি বাড়িতে পূজো সত্যিই ভাল হয়। সেখানে লোকজন বড় একটা ঘেঁষেনা। লোক আজকাল দুর্গোৎসব করে বারোয়ারী মণ্ডপে।

মাথা নেড়ে সনাতন বলল: ঠিক বলেছেন। দুর্গাপ্রতিমার বদলে একটা বাঁদর বসিয়ে দিলেও উৎসবের মাহাত্ম্য কিছু কম হতনা।

ছি ছি, অমন করে ব'লোনা।

সম্পাদক মশায়ের কথা মৃদু আর্তনাদের মতো শোনাল।

সনাতন তখুনি একথা মেনে নিল। বলল: আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন। সত্য কথা বড় অপ্রিয় শোনায়। কাজেই মিথ্যার প্রচলন এত বাড়ছে।

হরিহরবাবু আপত্তি করলেন, বললেন : সত্য অপ্রিয় হলেই মিথ্যা বলতে হবে, এ কথার কোন যুক্তি নেই। মুখ বন্ধ করে থাকা নামে একটা তৃতীয় অবস্থা আছে।

সনাতন তখুনি বলল : ওটি হল শোষক শাসকের আইন। মুখ বুজে অত্যাচার সইবে টুঁ শব্দটি করবেনা। টুঁ শব্দটি যে সবচেয়ে সত্য কথা।

হরিহরবাবু বিরক্তিভরে মুখ ফেরালেন।

সনাতন একটুখানি হেসে বলল : আমি উঠে যাব বাঁড়ুয্যে মশাই ?

কিন্তু বাঁড়ুয্যে মশায় এবারও উত্তর দিলেন না।

বাইরে তখন দিনের আলো মিলিয়ে যায়নি। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও নামবে। বুড়োরা তার আগেই গিয়ে বাড়িতে ঢুকবেন। যাদের বয়স কম, তারা তখন বেড়াতে বেরবে। সনাতনের বাড়ির টান থাকলে অফিস থেকে সোজা এখানে আসত না, বাড়ি হয়ে আসত। বাড়ির টান নেই বলেই অফিস থেকে সোজা এখানে আসে। তাতে অনেক পরিশ্রম বাঁচে। পাহাড়ে চলা মানেই তো পরিশ্রম। সমতলের লোক দেখলে এই কথাটা ভাল বোঝা যায়। সোজা রাস্তাতেই তারা হাঁপাতে হাঁপাতে চলে। ঘুরে ফিরে দুদিন দেখবার পরই ধিক্কার দেয় পাহাড়ে আসার নির্বুদ্ধিতাকে। তবু তারা আসে, পাহাড়কে ভালবাসে, ফিরে গিয়ে আত্মীয় পরিজনকে প্রলুব্ধ করে পাহাড়ে যাবার জন্য। সম্পাদক মশায়ের দৃষ্টি ছিল টেবলের উপর, কিন্তু মন যে অন্যদিকে ছিল, তা বোঝা গেল তাঁর কথা শুনে। বললেন : পূজোয় ক্ষতিটা কি হবে ?

এই কথাটি হরিহরবাবু বলতে চেয়েছিলেন। মুখ ফিরিয়ে বললেন : লোকজন সব এইবারে আসবে। এক একজন এক এক মূর্তি।

সনাতন বলে উঠল : সিমলার লোকেরা সঙই বটে।

না না, আমি সিমলার লোকের কথা বলছি না : হরিহরবাবু

প্রতিবাদ করলেন: আমি সমতলের লোকের কথা বলছি, যারা পূজোর ছুটিতে এখানে বেড়াতে আসে।

সনাতন কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সম্পাদক মশায়ের চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল।

হরিহরবাবু বললেন: আমাদের ছেলেমেয়েদের ওপর একটা গভীর প্রভাব পড়ে। তারা দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসে জীবনটাকে যেভাবে উপভোগ করে, আমাদের ছেলেমেয়েরা তাকেই সত্য ভাবে।

সনাতন বলল: আপনার ছেলে নিতান্তই ছোট, আর ভালমন্দ বুঝবার বয়স মেয়ের অনেকদিন আগেই হয়েছে।

হরিহরবাবু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, ভালমন্দ তুমি বোঝ?

ভাল মন্দ সকলেই বোঝে, কিন্তু সেই বোধটা সকলের এক নয়। আপনি যা মন্দ মনে করছেন, আপনার মেয়ে হয়তো তাই ভাল ভাবছে। আপনি হয়তো মেয়ের ভালমন্দ বোঝবার বয়স হয়নি বলে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন, আর স্মিতা এদিকে বার্ধক্যে আপনার মতিভ্রম হয়েছে ভেবে নিজের বিচারকেই ঠিক মনে করছে।

আমার মতিভ্রম হয়েছে?

হরিহরবাবু সোজা হয়ে বসলেন।

সনাতন বলল: আপনি রাগ করবেন না বাঁড়ুয্যে মশাই, কারও সঙ্গে মত না মিললেই আমরা তার মতিভ্রম হয়েছে ভাবি। নিজেরও যে ভুল হতে পারে, সে কথা একবারও মনে হয়না।

হরিহরবাবু এ কথার প্রতিবাদ করলেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: হুঁ।

সম্পাদক মশায় প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করলেন, বললেন: মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ কবে?

সনাতনের সামনে কিছু বলবার ইচ্ছে বোধহয় হরিহরবাবুর ছিলনা। সে কথা সন্দেহ করে সনাতনই উত্তর দিল: অঘ্রাণের আগে

হবেনা, পরেও না। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, স্মিতার বিয়ে হবে অগ্রাণের প্রথম সপ্তাহে।

এমন একটা উপসংহারে আসার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। সম্পাদক মশায় প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকালেন সনাতনের মুখের দিকে।

সনাতন হেসে বলল: আশ্বিন কার্তিকে বিয়ে হয়না, আর পাগল না হলে মাঘ মাসের শীতে সিমলায় কেউ বিয়ে করবেনা।

সম্পাদক মশায় হেসে জিজ্ঞাসা করলেন: ফাল্গুন বা বৈশাখে?

সনাতনও হেসে উত্তর দিল: বাঁড়ুয্যে মশায়ের তাড়া আছে।

হরিহরবাবু বললেন: তাড়ার কথা আমি কোনদিন বলেছি?

না।

তবে?

ওটা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

হরিহরবাবু আবার হেলান দিয়ে বসেছিলেন। সনাতনের কথা শুনে সহসা সোজা হয়ে বসলেন। বললেন: মানে?

সনাতনের হাসিটি মনোরম। বলল: আজকেও তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এই একটু আগে।

এবারে সম্পাদক মশায়ও বিস্মিত হলেন।

সনাতন বলল: আপনার উদ্বেগ দেখেই তাড়া বোঝা যাচ্ছে।

কী বললে?

অত্যন্ত বিনীতভাবে সনাতন বলল: সুস্থ মানুষের দৃষ্টি থাকে সোজা, ভুগে ভুগেই দৃষ্টি বেঁকে।

ভ্রূ কুঁচকে হরিহরবাবু বললেন: তোমারও তো দৃষ্টি বাঁকা, তুমিও ভুগছ নাকি?

ভুগেছিলুম: সনাতন কথাটা তখুনি মেনে নিল: এই ডান দিকটা অবশ হয়ে গেছে, এখন বাঁদিকে বোঝা বইছি।

বলে নিজের বাঁ কাঁধটা দেখাল।

সম্পাদক মশায় বললেন ঃ হরিহরের কী উদ্বেগ দেখলে ?

সনাতন তার পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করল। ভাল করে এক টিপ নস্যি নিয়ে বলল ঃ পূজো আসছে। পূজোয় এই পাহাড়ে নানা জাতের লোক আসবে। বাঁড়ুয্যে মশায় মেয়ের জন্যে যে পাত্র নির্বাচন করেছেন, তার যোগ্যতা সীমাবদ্ধ। গৃহস্থ ঘরের ছেলে। উন্নতির যে মইটাকে ধরেছে, তার সিঁড়ির সংখ্যা গোণাগুণতি। তার ওপর দাঁড়িয়ে সার্কাসের খেলা দেখানো চলবেনা। অথচ এ যুগের মেয়েরা শূন্যে ট্রাপিজের খেলা দেখতে চায়। এদিকে বিধায়ক যদি খুব পারে তো মাটির ওপর ডিগবাজি খেতে পারবে।

হরিহরবাবু দুচোখ বিস্ফারিত করে রেখেছিলেন।

সনাতন থামলনা, বলল ঃ স্মিতার একটু উচ্চাঙ্গের খেলা দেখার ঝোঁক আছে কিনা, পূজোর মরসুমটা তাই সুবিধের নয়।

বিস্ময়ে হরিহরবাবু হতবাক হয়ে গেছেন। এই ছেলেটা এত কথা ভাবতে জানে! এমন স্বচ্ছ ভাবে দেখে মানুষের মন! যেন রঞ্জন রশ্মি দিয়ে দেহের হাড় দেখছে।

সনাতন বলল ঃ এ আপনার স্মিতার দোষ নয় বাঁড়ুয্যে মশাই, এ হল এ যুগেরই ধর্ম। এ ধর্ম যে মানেনা, সে আবার মানুষ নয়। তাকে দেবতা বলতে পারেন, রাক্ষসও বলতে পারেন। মানুষ বললেই আমরা আপত্তি করব। দুর্বলতার শেষ নেই বলেই তো সে মানুষ।

হরিহরবাবু তাঁর মেয়েকে বোঝেন সকলের চেয়ে ভাল। এ নিয়ে তাঁর অহঙ্কার আছে। মেয়েকে নাকি বন্ধুর মতো মানুষ করেছেন। মেয়ের মনটা দেখতে পান নিজের মনের মতো। আজ তাঁর বিস্ময়ের সীমা নেই। একটা অনাত্মীয় যুবক আজ তাঁদের দুজনের কথা বলছে দৃঢ়তার সঙ্গে। এমন সব কথা বলছে যে প্রতিবাদ করবার মতো কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। সম্পাদক মশায় বোধহয় হরিহরবাবুর

এই দ্বন্দ্ব দেখতে পেয়েছেন। তাই সনাতনকে প্রশ্ন করলেনঃ তুমি কি মনোবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলে ?

সনাতন হেসে জবাব দিলঃ আজ্ঞে না।

তবে ?

সনাতন বললঃ অঙ্কের।

সম্পাদক মশায় বললেনঃ তোমার কথা শুনে আমাদের ভ্রম হয়।

সনাতন বললঃ ভাল করে ভেবে দেখলে আর হবে না। মনোবিজ্ঞান হল অনুমানের কথা, অঙ্কের মার নেই। ডাটা সাজিয়ে লিখতে পারলে হিসেব মিলবেই।

আমি এবারে উঠি ভাই।

বলে হরিহরবাবু উঠে দাঁড়াবার জন্য লাঠি গাছটা সংগ্রহ করলেন।

সনাতন তাড়াতাড়ি দাঁড়াল। বললঃ না না, আপনি কেন উঠবেন ! তার চেয়ে আমিই একটু ঘুরে আসি।

সনাতন লক্ষ্য করল, তাকে বাধা দেবার জন্য কেউই ব্যস্ত হলেননা। ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। সনাতন গল্প করতে জানেনা, নীরবে গল্প শুনতেও পারেনা। সে কাজ পারলে এমন করে তাকে বেরিয়ে যেতে হত না। সনাতন বেরিয়ে গেল।

সরু বারান্দা দিয়ে ঘুরে সনাতন মায়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়াল। আরতি শুরু হতে এখনও অনেক দেরি আছে। নিচের ক্লাবেও এখনও সভ্যরা একত্র হয়নি। আর একটু পরে সেখানে আড্ডা দেওয়া চলবে।

জীবনে এও একটা প্রশ্ন। যাদের জীবিকা চাকরি তাদের বিকাল পর্যন্ত বেশ কাটে। সন্ধ্যেবেলায় একটা কাজ করবার দরকার। একটু তাস পাশা, আড্ডা গল্প, ক্লাব সিনেমা। নিজের জন্যও দরকার, দরকার বাড়িতে যে সারাক্ষণ বন্দী হয়ে থাকে তার জন্যও। সংসারের বালাই না থাকলে শিল্পী হওয়া চলে। ছবি আঁকো, নয় কবিতা লেখো।

গানও গাইতে পারো, নয় বাজনা! বৈজ্ঞানিক হলে বই আর গবেষণা নিয়ে সময় কাটানো চলে। কিন্তু সনাতন এ সব দুঃসাহসিকতার কথা ভাবতে পারেনা। ঘরে বসে একা একা যারা সময় কাটাতে পারেন, সে তাদের নমস্য ভাবে। নিজে নিশ্চয়ই কোন দিনই তাদের দলে নাম লেখাতে পারবেনা।

উপরে দাঁড়িয়ে সনাতন নিচের শহরটাকে একবার দেখল। বড় সড়কটা গেছে নিচে দিয়ে। প্রমাণ মানুষগুলোকে শিশুর মতো দেখাচ্ছে। সনাতনের মনে হল, এ বুঝি আমাদের সমাজেরই একটি ছবি। কতগুলো মানুষ এমনি উপরে দাঁড়িয়ে নিচের লোকগুলোকে দেখছে কৃপার চোখে। ওই হতভাগাগুলো কিন্তু কোনদিনই তাদের নাগাল পাবে না। নিচের রাস্তা থেকে এই সাততলা কালী বাড়ীতে উঠতে ছোট ছোট ধাপ বাঁধানো আছে। তার জন্যে দম চাই অফুরন্ত। কটা লোকের এই দম আছে! সনাতন জানে, সরকারও এমনি উপরে উঠবার জন্য ছোট ছোট ধাপ বাঁধিয়ে রেখেছেন। লোক দেখানো ধাপ। শেষ পর্যন্ত আর কটা লোকে উঠতে পারে! যারা ওঠে, তারা ঐ ধাপ বেয়ে ওঠে না। তাদের জন্য হেলিকপ্টার আছে। সুপারিশের হাওয়ায় তারা বেশ ওড়ে। যাকে যেখান থেকে খুশি তুলে নিয়ে যেখানে ইচ্ছে বসিয়ে দেওয়া চলে। এ যে সরকারী হেলিকপ্টার!

গোসোয়ামি!

পিছনে ডাক শুনে সনাতন চমকে উঠল। ফিরে দেখল, চোপরা সাহেব তাকে ডাকছেন। কিছুদিন আগে ইনি তাদের অফিসের বড় সাহেব ছিলেন। এখন অবসর নিয়েছেন। অফিসে সনাতন তাঁকে সইতে পারতনা। এখন সে কথা মনে রাখবার প্রয়োজন বুঝি ফুরিয়ে গেছে। তাই তাঁর উত্তর দিল সহজভাবে। বলল: বলুন।

মিসেস চোপরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু পিছনে ছিলেন বলে সনাতন দেখতে পায়নি। দেখা সম্ভব নয়। মিসেস চোপরার মতো কয়েকজন মহিলাকে চোপরা সাহেব আড়াল করে রাখতে পারেন। সনাতন হাত জুড়ে তাঁদের নমস্কার করল।

চোপরা সাহেব বাঙলা জানেননা, তাই হিন্দীতেই গল্প শুরু করলেন। বললেনঃ আমি জানতাম যে তোমার দেখা আমরা এইখানে পাব।

এত কষ্ট করে আপনি আমার জন্যে এসেছেন! তা আমাকে ডেকে পাঠালেই তো পারতেন!

ছি ছি গোসোয়ামি, কি যে বল! অফিসে হুকুম করেছি বলে কি বাইরেও হুকুম করতে পারি? তুমি চিরকাল আমাকে অসামাজিক ভাবলে!

না সাহেব, তা কেন ভাবব! তোমার অন্য সমাজ, এইটুকু ভাবতাম। বোধহয় ঠিকই ভাবতাম।

চোপরা সাহেব কিছু অভিমানের ভঙ্গিতে বললেনঃ এ তোমার রাগের কথা। এখনও দেখছি তোমার রাগ পড়েনি।

সনাতন বলল ঃ আপনার সঙ্গে তর্ক করবনা। বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি।

চোপরা সাহেব তখুনি উত্তর দিলেনঃ সব করতে পার।

বলেন কি!

সনাতন বিস্ময় প্রকাশ করল।

চোপরা সাহেব বললেনঃ বিলেত থেকে আমার ছেলে আসছে। কত বছর পরে আসছে, সে তো তোমরা জান। আমার বড় আনন্দের দিন। তোমাদের সবাইকে একবার খাওয়াব।

সনাতন হেসে বলল ঃ এই কথা! তার জন্য চিন্তা করবেন না। আমরা বামুনের ছেলে, খবর পেলেই গিয়ে হাজির হব।

চোপরা সাহেবও হেসে উত্তর দিলেনঃ আর একদিন মায়ের পূজোর ব্যবস্থাও করে দাও।

আস্থন না, আজই করে দিচ্ছি।

বলে সনাতন তাঁদের অফিস ঘরের দিকে ডাকল। এক সময় আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলঃ একা আসছেননা নিশ্চয়ই!

চোপরা সাহের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন সনাতনের দিকে। বললেনঃ জানিনা।

কিন্তু তাঁর দুর্বলতা যে প্রকাশ হয়ে পড়ল। সনাতনের দৃষ্টি তা এড়াল না।

দুই

স্মিতা আসছিল ছোট সিমলার দিক থেকে। সঙ্গে বিধায়ক। তার অফিসের পোষাক। প্রায় সকল শ্রেণীর কর্মচারীই এখানে কোট পাৎলুন পরে অফিস করে। শীতের জন্য ধুতি পাঞ্জাবীর প্রচলন তত নেই। ওটা অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধদের একটা শৌখিন পোষাক। বিধায়ক যেদিন অফিসের পর বাড়ি হয়ে বেরয়, সেদিন টুইড আর ফ্লানেল ছেড়ে ভাল স্যুট পরে। সে ক্বচিৎ কদাচিৎ। তাড়াতাড়ি অফিস ছুটি না হলে এ কাজ সম্ভব নয়।

সহরের দিকে আসতে আসতেই স্মিতা বলল: তোমার কষ্ট হয় না?

বিধায়ক অন্যমনস্কভাবে পথ চলছিল। চমকে উঠে বলল: কী জন্যে বলত?

স্মিতা বলল: এই যে সারাদিন অফিসের পর তুমি এতদূর আস—

ও: বিধায়ক হাসল: ও কথা ভাববার সময় পাইনে।

স্মিতা বলল: তাহলে একটু ভেবে বল।

বিধায়ক হাসতে লাগল।

স্মিতা বলল: ধরে নিলাম যে তুমি অফিস থেকে বাড়ি যাওনা, সোজা আস ছোট সিমলা। পথ মাইল দুই নিশ্চয়ই হবে। তারপর বেড়ানো। সেও সেই রাস্তায় ফেরা। বাবার সঙ্গে দেখা না হলে দ্বিতীয়বার ছোট সিমলা। তারপর তোমার ফাগলি। সহরের ওপর থেকে সেটাকে পাতালপুরী ছাড়া আর কিছু মনে হবে না।

বিধায়ক গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল: কথাটা মিথ্যা বলনি।

স্মিতা বলল ঃ তবে রোজ এমন কর কেন ?

তাই তো ভাবি।

বিধায়ক আরও গম্ভীর হবার চেষ্টা করল।

আমি তোমায় ঠাট্টা করছিনা বুঝলে ঃ স্মিতা একটু দৃঢ়তা আনল কণ্ঠ স্বরে ঃ শরীরের পরিশ্রম কি পরিশ্রম নয়!

বিধায়কও গম্ভীর ভাবে বলল ঃ রাত পোহালেই সেটা ভুল হয়ে যায়।

কী মনে থাকে ?

বিধায়ক হাসল। বলল ঃ বলব ?

তাই তো জিজ্ঞেস করছি।

বিধায়ক সুর করে বলল ঃ আমি তোমায় গান গাহিতে বলি।

ভুল হল ঃ উত্তর দিল স্মিতা ঃ তুমি আমায় গান গাহিতে বল।

বলেই গুনগুন করে গাইল ঃ

তুমি আমায় গান গাহিতে বল,
বল, গাও।
মিনতি মাখা মদির চোখে বল,
গান শোনাও।
আকাশে আজ তারার মেলা
বাতাস করে মাতাল খেলা
তুমিও যে তারার মতো হাওয়ার মতো
সব চাও।

পথ সব জায়গায় সমতল নয়। পা টেনে টেনে তখন উপরে উঠতে হচ্ছে। স্মিতা আর গাইছিল না। বিধায়ক যখন বুঝল যে আর গাইবে না, তখন বলল ঃ এ গানটা আমি কারও মুখে শুনিনি।

কী করে শুনবে!

গানের তো পেটেন্ট নেই যে একজন গাইলে আর কেউ গাইতে পারবে না!

জানলে তো গাইবে!

তুমি ঠিক সিনেমার নায়িকার মতো কথা কইছ। তাদের মৌলিক গান, তাদের জন্যেই লেখা হয়েছে। তারা না গাওয়া পর্যন্ত রাস্তার ছেলেরা নকল করতে পারবে না।

স্মিতা উত্তর দিল: আমারও মৌলিক গান। অন্যের গাওয়া গান আমি গাই না।

এ সংবাদটি বিধায়কের জানা ছিল না! আশ্চর্য হয়ে বলল: তুমি নিজে গান লেখ, নিজে সুর দাও!

সেই জন্যেই তো যেমন কথা তেমনি সুর! ছন্দের গরমিল ঢাকি সুর টেনে টেনে।

বলেই আবার গাইল:

আমি থাকি দূরের পানে চেয়ে
ভাবনা আমার পরাণ গেছে ছেয়ে
শুধু গান কেন শুধু প্রাণ কেন
তুমি সব নাও।

বিধায়ক তার বাম হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল: এ গানটা কি তুমি আমার জন্যে লিখেছ?

স্মিতা নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল না, বলল: ভেবে দেখিনি।

বিধায়ক ক্ষুণ্ণ হল।

স্মিতা বলল: পুরুষের এই একটা দুর্বলতা। মেয়েদের সঙ্গে কি বন্ধুর সম্পর্ক হতে নেই, যেমন পুরুষে পুরুষে বা মেয়েতে মেয়েতে হয়! মেয়ে আর পুরুষ একত্র হলেই কেন আর একটা সম্পর্কের জন্যে মন আকুল হবে!

গল্পে উপন্যাসে এ কথা পড়তে বেশ লাগে।

জীবনেও ভাল লাগবে।

জীবনটা শুকিয়ে যাবার পর, তার আগে নয়।

চেয়ে চেয়েই শুকোবে। চাওয়া ভুলে যাও, অভাব ফুরিয়ে যাবে।

দিয়েও নাকি মন ভরে শুনেছি।

তোমার তো ভরেনি!

তুমি দিয়ে যাচাই কর।

স্মিতা বলল ঃ শুনেছি মন দিয়ে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না!

মন ভরে বলেই ফেরাতে ইচ্ছে করে না।

না ভরলে?

বুঝবে দেওয়াই হয়নি।

তুমি আজ কবির মতো কথা কইছ। কী হয়েছে বলবে?

একটা দুঃসংবাদ পেয়েছি।

বল।

কিন্তু বিধায়ক সে দুঃসংবাদের কথা বলল না। নীরবে পথ চলতে লাগল। জনবিরল ছায়াচ্ছন্ন পথ। নিচের স্কুলে ছেলেমেয়েদের ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। কলকাকলিতে পথ মুখর করে তারা বাড়ি ফিরে গেছে। এ পথে আর কটা লোক বেড়াতে বেরয়! লোক চলাচল করবে আর কিছুদিন পরে। পুজোর সময়। যারা বেড়াতে আসবে, তারা একদিন ছোট সিমলা যাবেই, আর একদিন সঞ্জৌলি। যারা হাঁটতে ভালবাসে, তারা এই পথে সমস্ত পাহাড়টা বেষ্টন করে সঞ্জৌলি দেখবে। সেখান থেকে বরফের দৃশ্য বড় মনোরম। কাজেই পথ এমন জনশূন্য থাকবে না।

উত্তরের জন্য স্মিতা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর বলল ঃ কী দুঃসংবাদ পেয়েছ বললেনা!

আর একদিন বলব।

আর একদিন কেন, আজই বল না।

আজ থাক, তোমার ভাল লাগবে না।

স্মিতা জেদ করল, বলল ঃ তা না লাগুক, তোমায় আজই বলতে হবে।

এত জোর ?

কেন করব না বল।

বিধায়ক হেসে বলল ঃ বিবাহিতা স্ত্রীরা শুনেছি স্বামীদের ওঠ-বস করায়।

বিয়ে না করেও স্ত্রী হয় নাকি ?

ভুল হয়েছে, বিবাহিতা মেয়ে বলা উচিত ছিল।

তবু ভাল ঃ স্মিতা মন্তব্য করল প্রসন্ন মুখে ঃ আমি অন্য রকম ভেবেছিলাম। দেশ কাল যা হয়েছে—

দেশ কালের দোষ কেন দিচ্ছ, তুমি কি অন্য যুগের মানুষ ?

সেই নির্জন রাস্তা গেল ফুরিয়ে। মেরিনা হোটেলের লাল চাল দেখা গেছে।

রিক্স স্ট্যাণ্ড বাঁ হাতে ফেলে ডান দিকে ফিরলেই জনাকীর্ণ শহর শুরু হবে। স্মিতা তার প্রশ্নের কথা ভোলেনি। বলল ঃ তোমার দুঃসংবাদের কথা বললেনা।

সেটা না শুনলে কি তোমার কিছুতেই চলে না ?

চলবেনা কেন। কিন্তু তুমিই বা কেন বলবে না ?

সনাতন বারণ করেছে।

সে বারণ করবার কে ?

কেউ নয়। তবু তার বুদ্ধিকে আমি শ্রদ্ধা করি।

করবেই তো।

ডান দিকের পাহাড় থেকে ঝির ঝির করে জল পড়ছিল। অনেক-গুলো বড় বড় ঝাউ গাছ সেখানে জটলা করছে। পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে সূর্যের আলো পড়ে। যাবার সময় বিধায়ক দেখে গেছে।

এখন আর রোদ নেই। তাই জায়গাটা এবারে ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। বিধায়ক বলল : আমি কি ভুল করি ?

স্মিতা উত্তর দিল না।

বিধায়ক বলল : দুঃসংবাদটা সনাতন নিজেই দিয়েছে। অফিসে আজ কথাটা বলেছিল। যা পাওয়া যায় না, তারই ওপর নাকি মেয়েদের লোভ। পরখ করে নিতে বলেছিল।

তুমি কি আমাকে পরখ করলে নাকি ?

কতকটা করলাম বৈকি। সে বলছিল, সিমলার সবচেয়ে সুন্দর জায়গায় বসে যদি তোমাকে ভাল ভাল কথা বলি, তুমি শুনতে চাইবেনা। কিন্তু দুঃসংবাদের খবর শোনবার জন্যে কত ব্যাকুল হয়েছ দেখ। যত আপত্তি করব, ততই তোমার জেদ বাড়বে।

মিথ্যে কথা !

সনাতন ভুল বলেছে ?

সনাতন কিছুই বলেনি। তোমার নিজের কথা তুমি সনাতনের নামে চালাচ্ছ।

আমার দরকার ?

তোমার খেলা !

ও। কিন্তু সনাতন আরও একটা কথা বলেছে। সেইটেই হচ্ছে আসল দুঃসংবাদ। বলেছে, এ কথা শোনবার জন্যে যদি বেশি পীড়াপীড়ি কর, তাহলে মঙ্গল নেই। বুঝতে হবে, তোমার মন এখনও স্থির হয়নি। মন স্থির না হলে প্রেম কেন খাঁটি হবে !

আবার কবিত্ব হচ্ছে।

কবিত্ব নয়। একেবারে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। এর বিবরণীটা সনাতনকে দিতে হবে।

তার জন্যে তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। সনাতন নিজেই অপেক্ষা করছে।

দুজনেই একসঙ্গে চমকে চাইল। পাহাড়ের দিকে ছায়ায় দাঁড়িয়ে সনাতন হাসছিল।

প্রশ্ন করল : ভয় পেলে নাকি ?

বলে পাশে পাশে চলতে শুরু করল।

বিধায়ক বলল : কেউ ভয় পেলে কি তার দোষ হবে ? অন্য কেউ না পেলেও আমি তোমাকে ভয় পাই।

মোহভঙ্গ হলেই বুঝতে পারবে যে ওটা ভয় নয়। ও হল সত্য-দর্শন। উলঙ্গ সত্যকে বড় বীভৎস দেখায়। সত্যকে সহজ করে গ্রহণ করতে অনেকটা সাহসের দরকার।

তোমার হেঁয়ালি ছাড়। যা শুনতে চেয়েছিলে তাই বলি।

উত্তর আমার জানা বিধায়ক, আমি তোমার জ্ঞানের জন্যে বলেছিলাম।

জোর দিল তোমার কথাটির উপর। তারপর স্মিতাকে বলল : আজ আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।

বলুন।

গান বাজনা তো আপনি ভাল বাসেন, জলসা মজলিশও। এ এক বড় লোকের বাড়ির জলসা। আমরা অপাংক্তেয় সেখানে।

সবটুকু শোনবার জন্য স্মিতা অপেক্ষা করতে লাগল।

সনাতন বলল : আপনাকে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

আপনারা ?

অচল।

স্মিতা সহসা কোন উত্তর দিতে পারল না।

সনাতন বলল : ব্যাপারটা খুলেই বলি। আমাদের চোপরা সাহেবকে তো চেনেন ! তাঁর সুযোগ্য পুত্র আসছেন বিলেত থেকে। দিল্লীতে এখন অত্যধিক গরম বলে সিমলায় কিছুদিন থাকবেন। তারপর শীত পড়লে সমতলে নামবেন। ওঁর নাকি গরমে গায়ে ফোস্কা

পড়ে। সেবারে স্পেনে বেড়াতে গিয়ে ফোস্কার জন্যে সুইডেনে যেতে হয়েছিল।

বিধায়ক ধমক দিল। বলল ঃ তুমি সিমলার কথা বল।

তাই তো বলছি। ছোট চোপরাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে চোপরা দম্পতি ইতিমধ্যে সিমলায় এসেছেন। তাঁদের বন্ধ বাড়িখানা ঝেড়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। রঙ চিত্তিরও হয়েছে। আমাদের অফিস থেকে ফুল ফোটা ফুলের চারা গেছে অগণিত।

সনাতন চট করে থামত না। তাই বিধায়ক বিরক্তি প্রকাশ করল ঃ আঃ।

সনাতন তখুনি সামলে নিল, বলল ঃ সেই চোপরা সাহেব এখন কালীবাড়ির অফিস ঘরে বসে আপনার অপেক্ষা করছেন। আমি দূত, আপনাকে সেখানে পৌঁছে দিতে পারলে চোপরা সাহেব নিজে আপনাকে অনুরোধ করবেন।

সেই সঙ্গে যোগ করল ঃ আপনাদের বাড়িটা বড় দূর কিনা!

স্মিতার উত্তর শোনবার জন্য বিধায়ক তার মুখের দিকে তাকাল।

স্মিতা বলল ঃ বাবা তো কালীবাড়িতেই গেছেন।

তিনিও আপনার অপেক্ষা করছেন।

রাস্তার ধারের দোকানপাট আলোয় আলোকময় হয়ে উঠছে। বিধায়করা আজ উপরে বসবার জন্য উঠল না। নিচে দিয়ে স্ক্যাণ্ডাল পয়েন্ট পেরিয়ে এল। স্ক্যাণ্ডালপয়েন্ট সাহেবদের দেওয়া নাম। কেলেঙ্কারি কথাটিই মুখরোচক। স্বাধীনযুগের নূতন নাম তাই এখনও চালু হলনা।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে চলবার পর বিধায়ক স্মিতাকে বলল ঃ তুমি যাবে?

সনাতন বলল ঃ কেন যাবেননা, নিশ্চয়ই যাবেন।

এতক্ষণ ধরে যে বিধায়ক এই কথাই ভাবছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

মনের ভিতর অভিমান তার গুমরে উঠল। বলল : আমি আত্মসম্মানের কথা ভাবছি। বড় লোকের বিলাসের জন্য স্মিতাকে দরকার কিনা, অতীতে যেমন খেমটার চল ছিল।

তুমি থাম : সনাতন ধমক দিয়ে উঠল : তোমার কোন যোগ্যতা থাকলে তুমিও নিমন্ত্রণ পেতে। চোপরা সাহেব সিমলার সমস্ত লোককে জলসায় ডাকবেননা।

এর পরে আর একটিও কথা হলনা। কালীবাড়ির দরজায় পৌছে সনাতন বলল : আপনি ভিতরে যান।

সেই সঙ্গেই বিধায়কের হাতখানা সে টেনে ধরল। স্মিতা এগিয়ে গেলে বলল : এস এই ধারটায়।

বলে আরও একটু নিচে নেমে আরও একটা মোড় ফিরে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। অনেক দূরে অনেক নিচে অ্যানানডেলের রেসকোর্স দেখা যাচ্ছে। এদিকে সেদিকে এক আধটা আলো জ্বলে উঠেছে। সনাতন বলল : কিছু দেখতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি।

এইবার নিজেকে কল্পনা কর ঐ জায়গায়, আর এই পাহাড়টা ভাববার চেষ্টা কর। কিছু দেখতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি।

তোমার স্মিতা এখন অ্যানানডেলের ময়দানে দাঁড়িয়ে চোপরা সাহেবের সিমলার সমাজ দেখছেন। একবার উঠে দেখে আসুন। পা যদি না ফস্কায়, তুমি সুখী হতে পারবে। ফস্কালেও দুঃখ নেই, সারা জীবন তোমাকে আপশোস করতে হবেনা।

বিধায়ক গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সনাতন বলল : দুঃখ ক'রোনা বন্ধু, তোমার উপকার করছি।

বিধায়ক এ কথারও উত্তর দিলনা।

তিন

কালী-বাড়ির অফিস ঘরে ঢুকে স্মিতা খানিকটা আশ্চর্য হল। তার বাবা একধারে গম্ভীরভাবে বসে আছেন। মিস্টার ও মিসেস চোপরা পাশাপাশি একখানা সোফায় বসেছেন সম্পাদক মশায়ের সামনে। মিস্টার চোপরা কথা কইছেন, কিন্তু শ্রোতা কে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দরজার উপরে স্মিতাকে দেখে মিস্টার চোপরা প্রচুর খুশী হলেন। বসে বসেই উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি করলেন। অতিরিক্ত মোটা না হলে সোজা হয়েই দাঁড়াতে পারতেন।

স্মিতাকে অভ্যর্থনা করলেন সম্পাদক মশায়, বললেন: এস মা, তোমার জন্যেই অপেক্ষা হচ্ছে।

স্মিতা না বসা পর্যন্ত চোপরা সাহেব একটু উঁচু হয়ে রইলেন। স্মিতা ওধারে তার বাবার পাশে গিয়ে বসতেই তিনি সহজ ভাবে হেলান দিয়ে বসলেন। বললেন: শরীরটা একটু বেয়াড়া না হলে আমি নিজেই তোমাদের বাড়ি যেতাম। ছোট সিমলা দূর আছে, কিন্তু ওঠানামা বেশি নয় শুনছি। একদিন যাব তোমাদের বাড়ি।

মেয়ে ও মেয়ের বাবা একই সঙ্গে উত্তর দিলেন। মেয়ে বলল: বেশ তো, সে তো আমাদের সৌভাগ্যের কথা।

মেয়ের বাবা বললেন: তার কী দরকার আছে! শুধু শুধু কেন কষ্ট করবেন!

চোপরা সাহেব বললেন: কষ্ট আর এমন কি ব্যানার্জি। তোমরা চিরকাল আমার কষ্টটাই দেখলে, আনন্দও যে কিছুতে পাই তার খবর রাখলেনা।

মনে মনে হরিহরবাবু বিশ্বাস করেন যে সনাতন উপস্থিত থাকলে

এ কথার উপযুক্ত উত্তর সে দিতে পারত। সনাতনের মতো ঠ্যাটা হতে হরিহরবাবুর আপত্তি আছে। তাই তিনি চুপ করে গেলেন।

স্মিতা সবাইকে নমস্কার করছিল। এইবার মিসেস চোপরার দিকে তাকাল কিছু শোনবার জন্য। স্মিতাকে তিনি এতক্ষণ লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। কোন কথা কইলেন না।

স্মিতা বলল : আপনারা এখন দিল্লীতে থাকেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন চোপরা সাহেব নিজে। বললেন : বাধ্য হয়েই আছি। সরকার বাহাদুর যে ছেড়েও ছাড়ছেন না।

হরিহরবাবু জানেন যে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। কাজেই এই উত্তরটা একটু হেঁয়ালির মতো শোনাল। কিন্তু কিছু জানবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করলেন না।

চোপরা সাহেব বোধহয় আশা করেছিলেন যে সরকার বাহাদুরের এই মর্জির কথা কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে। তাই খানিকক্ষণ ধরে সবার মুখের দিকেই চাইলেন। তারপর নিজেই বললেন : এ ছাড়া সরকারের আর উপায় কী বল! আজকালকার ছেলে ছোকরা দিয়ে তো দেশ শাসন চলবে না!

হরিহরবাবু কোন কথা কইলেন না।

চোপরা সাহেব নিজেই তাঁর বক্তব্যটা স্পষ্ট করে বোঝাতে লাগলেন। সরকারী দপ্তর কী ছিল, আর কী হয়েছে। স্বাধীনতার মানে তো ফাঁকি নয়, উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয়ও নয়। অফিসে এসে কেউ কাজ করবেনা, কয়েক ঘণ্টা হাজিরা দিয়ে গেলেই মাসের পুরো মাইনে। তার উপর সব দোষের সাত খুন মাপ। উপরওয়ালার হাত-পা কাটা। কী একটি আর্টিকল আছে কনস্টিটিউসনে, তিনশো এগার না কত, সরাসরি শাস্তি দেবার কারও কোন ক্ষমতা নেই। তার জন্যে কত বায়নাক্কা। তারা নিজের কাজ করবে, না বনের মোষ তাড়াবে!

মিসেস চোপরা বুঝি এতক্ষণে কথা কইবার প্রয়োজন বোধ করলেন, বললেন : কাজের কথা বল।

চোপরা সাহেব অপ্রতিভ হবার লোক নন, বললেন : এও কাজের কথা। বইএর যেমন ভূমিকা, এ হল কাজের ভূমিকা!

মিসেস চোপরা বললেন : তুমি কি কাজের জন্যে ডাকছ যে তার ভূমিকা করতে হবে ? নিমন্ত্রণের আবার অত কথার কী দরকার!

তা বটে, তা বটে : চোপরা সাহেব উত্তর দিলেন : ও আমার একটা স্বভাবের দোষ। ভূমিকা না করে কোন কাজই করতে পারিনা।

সনাতন থাকলে সে অন্য কথা বলত। বলত, চোরের মন। উদ্দেশ্য তো নিমন্ত্রণ নয়, কাজ করানোই উদ্দেশ্য। নিমন্ত্রিত হয়ে যাঁরা আসবেন, তাঁদের আনন্দ বিধানের জন্য স্মিতার প্রয়োজন। দিল্লী হলে এত ভাবতে হতনা, সেখানে গান বাজনা অনেকে জানে। হরিহরবাবুর মুখ দেখে মনে হল, সনাতন না বললেও তিনি বোধহয় এইরকমই কিছু অনুমান করতে পেরেছেন। তাই নিতান্ত গম্ভীর মুখে সব কিছু শুনেই যাচ্ছেন।

স্মিতা বলল : ভূমিকা তো অবান্তর নয়। তা হলে শ-এর সাহিত্যে প্রিফেসগুলো এত আদৃত হতনা।

ঠিক বলেছ : চোপরা সাহেব প্রচুর তারিফ করলেন : সময় মতো সব কথা আর মনে পড়েনা।

সম্পাদক মশায় তখন তাঁর কাজে মন দিয়েছেন। তাড়াতাড়ি সব কাজ শেষ করে ফেলা উচিত। অন্ধকার নামছে, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডাও নামবে। অন্ধকারে শীতের বিষ মেশানো আছে। অন্ধকার যত গভীর হবে, শীতও তত তীক্ষ্ণ হবে। পাহাড়ের আলোয় আছে আরামের আস্বাদ। বুড়োরা তাই আলো থাকতেই বাড়ি ফিরতে চান। চোখের কষ্টও তাতে কম হয়। সম্পাদক মশায় হাত চালাচ্ছেন।

হরিহরবাবু যে নিস্পৃহ ছিলেননা, তা বোঝা গেল তাঁর একটি প্রশ্নে। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন : বিধায়ক এসেছে ?

কথা না বলে স্মিতা ঘাড় নেড়ে জানাল, এসেছে।

হরিহরবাবু বড় নিশ্চিন্ত হলেন। মেয়ের ভাবনা আর রইলনা। দেরি হলে বিধায়কই পৌঁছে দেবে। কিন্তু চোপরা সাহেব তৎপর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন : বিধায়ক কে ?

প্রশ্নটা হরিহরবাবুকেই করেছিলেন, তাই তিনিই উত্তর দিলেন, বললেন : আমাদের অফিসেরই একটি ছেলে।

কোন্ ছেলেটি বলতো!

বি. চ্যাটার্জি।

চ্যাটার্জির নাম বুঝি বিধায়ক ! চিনেছি এইবারে। সেই ফর্সা-মতো ভালমানুষ ছেলেটি !

এর পরে আর কোন প্রশ্ন না করে চোপরা সাহেব হরিহরবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। মানেটা স্পষ্ট। এই বিধায়ক সম্বন্ধে আর কিছু বলার থাকলে বল। পারিবারিক ব্যাপারে প্রশ্ন করাটা অসৌজন্য হবে। কিন্তু হরিহরবাবু তাঁকে উত্তর না দিয়ে মেয়েকে বললেন : তুমি আজ বিধায়কের সঙ্গেই ফিরো। আমাকে এখুনি ফিরতে হবে।

কাগজপত্র গোটাতে গোটাতে সম্পাদক মশায় বললেন : একটু দাঁড়াও। আমিও তোমার সঙ্গে বেরব।

চোপরা সাহেব বললেন : আমরাই বা বসে থেকে কী করব ! আমরাও উঠি।

তারপরেই স্মিতাকে বললেন : তোমার বাবাকে বলেছি। বিলেত থেকে আমার ছেলে আসছে বলে একটু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। হাই টি। আর একটু গান বাজনা। আসতে হবে কিন্তু।

শেষের কথাটি বড় সহৃদয় মনে হল।

উত্তর দিতে স্মিতা এক মুহূর্ত দেরি করলনা। তখুনি বলল: নিশ্চয় যাব।

চোপরা সাহেব খুশী হলেন অপরিমিত। কিন্তু হরিহরবাবুর মুখ মলিন হল। তিনি বোধহয় আশা করেননি যে তাঁর মেয়ে এমন সহজে রাজী হয়ে যাবে।

চোপরা সাহেব অনেক কসরৎ করে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন: তাহলে ব্যানার্জি—

হরিহরবাবু বসে বসেই হাতজোড় করলেন: আচ্ছা।

মিসেস চোপরা দরজার কাছেই ছিলেন, বেরিয়ে যেতে বেশি সময় লাগলনা।

সম্পাদক মশায়ের উঠবার তাড়া বুঝি ফুরিয়ে গেছে। পকেট থেকে সিগারেট বার করে বললেন: তোমার তো এসব চলেনা।

বলে নিজেই একটা ধরালেন।

স্মিতা বুঝতে পেরেছে যে তার বাবা তাকে সমর্থন করেননি। কিন্তু বাধা কিসের তা বুঝতে পারেনি। বলল: তুমি কি চাওনা যে আমি কোথাও বেড়াতে যাই?

হরিহরবাবু বললেন: চল এবারে উঠি।

বলেই উঠে দাঁড়ালেন। সম্পাদক মশায়ও উঠলেন। স্মিতা বলল: আমার কথার উত্তর দিলেনা বাবা?

আমার উত্তর তো তুমি জানো মা।

শুধু জানলেই হবেনা। আমাকে দোষের কথা বলতে হবে।

দোষ তোমার নয়। এ আমাদের সমাজের দোষ। গান্ধীজী বলেছিলেন, হরিজনদের সঙ্গে এক পাতে বসে খেতে। আমরা খেয়েও ছিলুম, তাতে জাতের বিচার সবটা না যাক, খানিকটা গেছে।

হরিহরবাবু একটু থেমে বললেন: বিত্তের বিচারে আমরা হরিজন, পদমর্যাদার বিচারেও, আমাদের সম্বন্ধে গান্ধীজী কিছুই বলেননি।

কেউ বলবেও না। সনাতন ঠিকই বলে যে স্বাধীন ভারতে একটা কুলীন সম্প্রদায় গড়ে উঠছে, একটা মহা ব্রাহ্মণের সম্প্রদায়। আমাদের মতো তারা বাবু হয়ে ঢোকেনা, ঢোকে সাহেব হয়ে। গোঁফ গজাবার আগে বাপের বয়সী বাবুকে ডাকে নাম ধরে, দেশের দুর্দশার জন্য দায়ী করে দেশসুদ্ধ লোককে। এরাই ভারত সরকারের মহাব্রাহ্মণ।

সম্পাদক মশায় বললেন: আজ তুমি উত্তেজিত হয়ে উঠছ হরিহর।

হবার মতোই কথা যে। তুমি তো এর সঙ্গে কাজ করনি, তুমি এর সবটুকু পরিচয় জানোনা। সনাতন জানে, বিধায়ক জানে। ওদের তুমি জিজ্ঞেস করতে পার।

কী জিজ্ঞেস করব?

ঐ লোকটা নেমন্তন্ন করতে এসেছে, না এসেছে কোন মতলব নিয়ে।

স্মিতা বলল: মতলব আবার কী থাকতে পারে?

উত্তর না দিয়ে হরিহরবাবু একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

হাসলে যে!

স্মিতা জানতে চাইল।

হরিহরবাবু বললেন: শুনে সব কথা বিশ্বাস হয়না মা, ঠেকে বিশ্বাস হয়। নিমন্ত্রণ রক্ষায় তুমি যখন যাবে ঠিক করেছ, তখন নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে। আত্মসম্মানজ্ঞানটুকু বাড়িতে রেখে যেও।

স্মিতা খুবই আশ্চর্য বোধ করছিল। কিন্তু বলবার মতো কথা খুঁজে পাচ্ছিলনা।

সম্পাদক মশায় বললেন: এ তোমার বাড়াবাড়ি কথা।

মায়ের মন্দিরের দরজায় তিনজনেই প্রণাম জানালেন। তারপর

বারন্দা পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় এসে উঠলেন। হরিহরবাবু বললেন ঃ তুমি তো নিচের রাস্তা ধরবে, আমরা এদিকে এগোই।

কথা না বলে সম্পাদক মশায় বাঁ দিকের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হরিহরবাবু লাঠি ঠুকে ঠুকে উপরে উঠতে লাগলেন। একটু এগিয়েই সমতল পথ। ছোট সিমলা পর্যন্ত গড়িয়েই পৌঁছে যাবেন। তখন আবার কথা কইবেন।

সমতল রাস্তায় পৌঁছে হরিহরবাবু বললেন ঃ আজ বোধহয় আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলুম, তাই না?

তাঁর কণ্ঠে অনুতাপের সুর শোনা গেল। কিন্তু উত্তরটা শুনে তিনি চমকে উঠলেন। পথের পাশ থেকে সনাতন বলে উঠল ঃ পুরনো দিনের কথা বোধহয় মনে পড়ে গেছে।

হরিহরবাবু এ কথার আর উত্তর দিলেন না।

সনাতন খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বলল ঃ আপনার নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ হয়নি?

স্মিতা বিস্মিতভাবে বলল ঃ তাই নাকি বাবা?

হরিহরবাবুর উত্তর না পেয়েই বোঝা গেল যে সনাতন ঠিক বলেছে। স্মিতা বলল ঃ আশ্চর্য তো!

সনাতন হেসে বলল ঃ আশ্চর্যের কী আছে! আমাদের ওপর-ওয়ালা যখন ছিলেন, তখন আমাদের নিজের চাকর ভাবতেন। এখন কি সেই চাকরদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াবেন? একি বাঙলা দেশের সেকেলে জমিদার, যে বিয়ে সাদি পুজো পার্বনে গ্রামসুদ্ধ প্রজার নেমন্তন্ন হবে!

স্মিতা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল ঃ আপনার ঠাকুর্দা কি জমিদার ছিলেন?

সনাতন বলল ঃ আপনার প্রশ্নটা বুদ্ধিমানের মতো হয়েছে।

উত্তরটা?

এদেশে আজ কারও জমিদারী নেই।

আজকের কথা আমি জানতে চাইছিনা, আমি আপনার ঠাকুর্দার কথা জিজ্ঞাসা করছি।

সে কথা জানতে চাইবার অধিকার কি কারও আছে! আমাকে গাল দিতে পারেন, আমার বাপঠাকুর্দার কথা তুলবেননা।

স্মিতা এতটুকু লজ্জিত হলনা। বলল : বুঝেছি।

কী বুঝেছে, সনাতন সে কথা জানতে চাইলনা। সে যে তার নিজের সম্বন্ধে আলোচনা পছন্দ করেনা, সেটুকু বোঝাতে পেরেছে জেনেই সুখী হল।

হরিহরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : বিধায়ক কোথায়?

ক্লাবে।

স্মিতা বলল : আপনারা তো একসঙ্গেই ছিলেন।

তা ছিলাম। চোপরা সাহেব আমাদের আলাদা করেছেন।

মানে?

মানে খুব সরল। বিধায়ককে বাদ দিয়ে আমাকে নেমন্তন্ন করার দরকার ছিল। মন্দিরের সামনে থেকে তাই আমাকে টেনে আনলেন। তাকে আমি ক্লাবে অপেক্ষা করতে বলে এলুম।

হরিহরবাবু গম্ভীরমুখে বললেন : তোমার তবলার জন্যে বুঝি?

প্রায় একই সঙ্গে স্মিতা বলল : আপনি যাবেন বললেন?

আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে। আপনি না গেলে আমার যাবার কোন সার্থকতা নেই।

স্মিতা বলল : আমি যাব কিনা, আপনি জিজ্ঞেস করলেন না?

তার প্রয়োজন নেই।

কেন?

আপনি না গিয়ে থাকতে পারবেন না।

কেন?

বিধায়ককে সে কথা বলেছি।

আমাকে বলতে আপত্তি আছে?

কাল ছুটি আছে। ভোরের বেলায় বিধায়ক জাকু পাহাড়ে উঠবে। যদি সঙ্গে যান, সেই আপনাকে সব বলতে পারবে।

হঠাৎ জাকু পাহাড়ে কেন উঠবে?

অনেকদিন ওঠেনি বলে শখ হয়েছে।

আর কে উঠবে?

কেউনা।

আমাকেও তো সে কিছু বলেনি।

বলবার সুযোগ পায়নি বলে আমাকে বলতে বলেছে। রাজী থাকলে ভোরবেলায় আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবে।

হরিহরবাবু এতক্ষণ একটিও কথা বলেননি। এবারে বললেন: বেশ তো!

সনাতন হাসল। বলল: আমি আর এগোবনা।

স্মিতার দিকে চেয়ে বলল: তাহলে সেই কথাই রইল। বিধায়ককে আমি বলে দেব।

স্মিতা উত্তর দিলনা।

চার

ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া স্মিতা পছন্দ করে না। ভোর বেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে সারাদিন তার ঘুম পায়। কোন কাজে উৎসাহ থাকে না, কোন কাজ ভাল লাগে না। নিজে থেকে ঘুম ভাঙ্গার একটা তৃপ্তি আছে। শেষরাতে ভাঙ্গলেও খারাপ লাগে না। তখন ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। পুরনো বাড়ি ঘর গাছ পালাকেও নূতন বলে মনে হয়। স্মিতা ভেবেছিল, বিধায়ক এসে ভোর বেলায় তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবে। তারপর সারাদিন তার মেজাজটা থাকবে খারাপ হয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উল্টো হল। বিধায়ক আসবার অনেক আগেই তার ঘুম ভাঙল। আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরের জগৎটাকে দেখল ভাল করে। অন্ধকার কেটে যায়নি, খানিকটা স্বচ্ছ হয়েছে মাত্র। জ্যোতির্ময়ের প্রসন্ন প্রকাশের প্রতীক্ষায় পৃথিবী উন্মুখ হয়ে আছে। স্মিতার ভারি ভাল লাগল।

তাড়াতাড়ি সে তৈরি হয়ে নিল। ক্লোকটা হাতে নিয়ে যখন বেরতে যাবে, মা বললেন : একটু চা খেয়ে যাবি না?

স্মিতা ভারি বিস্মিত হল। এতটুকু শব্দ না করে সে এতক্ষণ তৈরি হয়েছে। একবারও ভাবতে পারেনি যে মায়ের ঘুম ভেঙ্গেছে। বলল : ও সব হাঙ্গামা আর করব না।

মা বললেন : হাঙ্গামা নাই বা করলে!

স্মিতা ফিরে দাঁড়াল। মায়ের গলা তো শোবার ঘর থেকে আসছেনা! বলল : তুমি কি রান্না ঘরে?

মা এ কথার উত্তর দিলেন চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে। বললেন : কী খাবি বলতো?

স্মিতা বলল ঃ এই চাটুকু ফ্লাস্কে ভরে নিলে তোমার আপত্তি হবে ?

মা মনে মনে হাসলেন কিনা বোঝা গেল না, বললেন ঃ ফ্লাস্ক আমি ভরে দিচ্ছি।

স্মিতা আশ্বস্ত হল, তবু বলল ঃ আমি একা খাব ?

আর কে খাবে বল ? তোমার বাবা ঘুমচ্ছেন, পল্টুও।

তুমি তো পুজো না করে খাবে না !

বাইরে বুঝি জুতোর শব্দ শোনা গেল। চায়ের পেয়ালা হাতে না নিয়ে স্মিতা দরজা খুলে বারান্দায় বেরল। বিধায়ক এসেছে। খুশী হয়ে বলল ঃ এস এস, একা আমি চা খেতে পাচ্ছিনা।

স্মিতার মা শুধু চা খাওয়ালেননা। পাহাড়ের মাথায় বসে খাবার জন্যে চা আর স্যাণ্ডুইচ বেঁধে দিলেন। বললেন ঃ একটু সময়মতো ঠিক করলে ভাল খাবার করে দিতাম।

বিধায়ক বলল ঃ পল্টু যাবে না ?

মা বললেন ঃ ও ঘুমচ্ছে, ঘুমোক।

স্মিতা আপত্তি করলনা।

পথে নেমে বিধায়ক গাইল গুণগুণ করে ঃ তুমি আমায় পথ চলিতে বল—

স্মিতা হেসে বলল ঃ তারপর ?

তারপর আর মেলাতে পাচ্ছিনা।

ব্যস ?

ব্যস।

স্মিতা গাইল সহজ ভাবে ঃ

তুমি আমায় পথ চলিতে বল,
চল পথ।
সরম ভরে মিনতি করি বল,
নাই রথ।

স্মিতা থামতেই বিধায়ক বলল ঃ অদ্ভুত।

অদ্ভুত আবার কী!

অদ্ভুত নয়! মুখে মুখে তুমি গান রচনা করছ!

এ আবার কোন রচনা হল, না সুর হল গানের মতন।

বিধায়ক এ কথার উত্তর দিল না। বলল ঃ হঠাৎ তোমার জাকু পাহাড়ে ওঠবার শখ হল কেন?

মানে?

স্মিতা গভীর বিস্ময়ে তাকাল বিধায়কের মুখের দিকে।

বিধায়ক বলল ঃ জাকু পাহাড়ে কি আজ উৎসব আছে?

আমিও তোমাকে সেই কথাই জিজ্ঞেস করছি।

আমাকে? আমি কী করে জানব! আমি তো তোমার কাছেই উত্তর চাইছি।

স্মিতার কাছে ব্যাপারটা কেমন এলোমেলো মনে হল! তারপরেই মনে পড়ল সনাতনের কথা। বলল ঃ সনাতন তোমায় কী বলেছে?

নিজে কিছুই বলেনি। বলেছে তোমার কথা।

কী কথা বল।

বলেছে তুমি জাকু পাহাড়ে উঠবে। আমাকে সঙ্গী চাই। ভোর বেলায় যেন তোমাকে আমি ডেকে নিয়ে আসি।

স্মিতা বলে উঠল ঃ উঃ কী সাংঘাতিক লোক।

সে কি!

আমাকে সে কী বলেছে জান? বলেছে তুমি উঠবে জাকু পাহাড়ে, আর আমাকে সঙ্গে থাকতে হবে।

বিস্ময়ে বিধায়ক হতভম্ব হল। তারপরেই হেসে উঠল হাহা করে। বলল ঃ লোকটার রসজ্ঞান আছে।

স্মিতা চটে উঠেছিল। এই হাসিতে একটু হাল্কা হয়ে বলল ঃ কোন মতলবও নিশ্চয়ই আছে।

কী মতলব থাকবে ?

সে কথা অনেকদিন পরে আমরা বুঝব।

এটা গুণেরই কথা। যুগের চেয়ে সে এগিয়ে চলছে।

আমি একে গুণ বলিনা।

সে স্বার্থপর হলে আমিও বলতুমনা। সনাতনের কথায় ও কাজে বৃহত্তর স্বার্থ আছে, নিজের নেই। এই জন্যেই তাকে সবাই সহ্য করে।

আজকের এই ঠকানোর ব্যাপারে এমন বৃহৎ স্বার্থ কী থাকতে পারে ?

জনহীন পথ ধরে তুজনে হাঁটছে। সমস্ত সিমলা আছে ঘুমিয়ে। সিমলার লোক এত সকালে ওঠে না, ওঠবার প্রয়োজন হয়না। এই সময়টায় লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতেই ভাল লাগে। নিচের দেশ থেকে যারা বেড়াতে আসে, তাদের অনেককে উঠতে হয়। জাকু পাহাড় আছে, রোদ বেড়ে গেলে উঠতে কষ্ট হয়। প্রস্পেক্ট হিল আছে, তারা দেবী আছে, সকাল সকাল গিয়ে ফিরে আসতে মন্দ লাগে না। হোটেলওয়ালারা ব্রেকফাষ্ট বড় দেরিতে দেয়। কাছে পিঠের অনেক জায়গা ততক্ষণে ঘুরে আসা যায়। তবু দেখা গেছে, সকলে সকালে উঠতে চায় না। রাত থাকতে বেরবার মতো সজীব মন খুব কম লোকেরই আছে। আজ বিধায়ক ও স্মিতা উঠেছে শেষ রাতে। যে বুড়ো পাহাড়টাকে তুবেলা দেখে দেখে বুড়ো হয়ে বিরক্তি ধরে গেছে, সেই পাহাড়ে উঠবে তুজনে। কোন উৎসব নেই, কোন প্রয়োজন নেই। একজন উঠবে জেনে আর একজন এগিয়ে এসেছে। না এলেও তো পারত। কিন্তু কেন এল ?

স্মিতা জিজ্ঞাসা করল ঃ ঐ লোকটার কথা তুমি কী বলে বিশ্বাস করলে ?

আর তুমি ?

তুমি যে নিজে এলে আমাকে ডাকতে। তোমাকে তো ফেরাতে পারিনে।

আমারও ঐ কৈফিয়ৎ। সকালবেলায় অনেকদিন তোমাকে দেখিনি।

সূর্য উঠেছে কিনা বোঝবার উপায় নেই। পূর্বের দিগন্তটা পুরোপুরি পাহাড়ে ঢাকা। জাকু পাহাড়। এই পাহাড় ডিঙিয়ে সূর্যের আলো আসবেনা। আসবে দক্ষিণে ছোট সিমলার দিক থেকে। পাহাড় সেখানে শেষ হয়ে গেছে। এই সময়ে সকালের প্রথম রোদ পৌছবে রাষ্ট্রপতির প্রাসাদে। সামার হিলে। তারপর ধীরে ধীরে সিমলার দিকে আসবে। গ্রাণ্ড হোটেল আর কালীবাড়ির ছাদ ছোঁবে। খানিকটা রোদ ফাগলিতেও ছিটকে পড়বে। বিধায়ক সকাল বেলাতেই এই রোদ পায়। একবার আকাশের দিকে আর একবার স্মিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ আমার বাড়িতে হলে তোমার মুখ এতক্ষণ আলোয় ভরে যেত।

আলোয় কি আমার মুখটা বেশি ভাল দেখ?

এখন সব চেয়ে বেশি ভাল দেখছি।

এই অন্ধকারে?

যখন চোখে দেখতে পাইনে তখন আরও বেশি ভাল লাগে।

এ তোমার হ্যাংলামি।

স্মিতা ভ্রূকুটি করল কিনা বিধায়ক দেখতে পেলনা। বলল ঃ অস্বীকার করব না। কিন্তু হ্যাংলাকে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি নিজেও কি বদনাম নিচ্ছনা?

আমি অবলা।

বোধহয় একজনের কাছে।

গুণ গুণ করে স্মিতা গাইল ঃ

তুমি আমায় পথ চলিতে বল।
চল পথ।

পথ চলার কথা এখানে মনে হয় বৈকি। প্রায় সমতল মল রোড ছেড়ে এবারে রিজের উপর উঠতে হচ্ছে। গির্জাটা পাশে রেখে জাকু পাহাড়ের পথ ধরতে হবে। এ পথে মোটর চলে না। চলে রিক্সা। তাকেও চলা বলে না। কয়েকটা টাকার জন্য জন কয়েক মানুষ পশুর মতো পরিশ্রম করে। স্মিতা ভাবতে পারেনা, মানুষ কী করে রিক্সয় বসে পাহাড়ে ওঠে। কথাটা সনাতন বলেছিল। অমানুষ না হলে মানুষে টানা রিক্সয় বসা চলেনা। না চড়লে ওরা কী খাবে? অন্য মানুষরা কি খায় না? মানুষকে মানুষের মতো বাঁচতে দেবার দায়িত্ব কি মানুষের নয়?

তারপর?

বিধায়ক স্মিতাকে থামতে দেবে না।

স্মিতা আর গাইল না। বলল: ক্লোকটা খুলে ফেলি।

না না, এখন খুলো না। পকেট থেকে হাত বার করলেই দেখবে, হাওয়ায় কত হিম আছে।

এদিকে যে ঘামতে শুরু করেছি।

ও পরিশ্রমের ঘাম, গরমের নয়, একটু আস্তে চল।

রিজের উপর প্রভাতের আলো ঝকঝক করছে। এমন প্রশস্ত জায়গায় এখন জনমানব নেই। দুধারের বেঞ্চগুলো একেবারে খালি পড়ে আছে। উঁচু বেঞ্চগুলো প্রহরী বলে ভ্রম হচ্ছে। উত্তরের উঁচু গাছে অন্ধকার আর জমে নেই। উদার আকাশ দেখা যাচ্ছে নীল সমুদ্রের মতো। আরও খানিকটা এগিয়ে তুষার শিখর দেখা গেল। আকাশের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামনের পাহাড়টাকে বড় বেয়াড়া দেখাচ্ছে। বড় বেরসিক। মনে হচ্ছে, তার পাহাড়ের পাগড়ি দিয়ে কনে বউএর মুখখানি যেন ঢেকে দিয়েছে। কনে বউই তো। ঘোমটার আড়ালে তার বরফের মুখখানা যেন ঢেকেই আছে। লজ্জাবতী।

স্মিতা বলল ঃ দেখেছ, আমরা একা নই একেবারে!

চারিদিকে তাকিয়ে বিধায়ক দেখল, সত্যিই তাই। একা কাউকে দেখতে পেল না। দেখল জোড়ায় জোড়ায়। উত্তরে বুড়ো গাছটার নিচে ঘেঁষাঘেষি করে বসেছে তুজনে। আর তুজন চলেছে লক্কড় বাজারের দিকে।

উপরের দিকে তাকিয়ে, স্মিতা চমকে উঠল। তার চমকানি দেখেই বিধায়ক সেদিকে তাকাল। এক ভদ্রলোককে দেখল সেই ছোট বাগানটির ভিতর একেবারে একাকী বসে আছেন। এই ঘেরা জায়গাটুকুর ভিতর টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। ব্যালাক্লাভা টুপিতে তাঁর মুখখানি ঢাকা। কত বয়স তা বোঝবার উপায় নেই। এত ভোরে এই ভদ্রলোক কী করে ঢুকলেন! একা বসে এমন গভীরভাবে কী ভাবছেন তিনিই জানেন। বিধায়কের মনে হল, এই লোকে লোকারণ্য পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ মানুষও আছে। একদল লোক ওর পাশে গিয়ে বসলেও উনি অমনি নিঃসঙ্গ বোধ করবেন। সঙ্গী দিয়ে মানুষের নিঃসঙ্গতা বুঝি ঘোচেনা। বিধায়করা তাঁর পাশ দিয়ে গিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল।

আস্তে আস্তে স্মিতা বলল ঃ বোধহয় পাগল, তাই না!

পাগল কেন?

তা না হলে এই শীতের সকালে কেউ একলাটি বসে থাকে!

ওর সঙ্গী যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে!

হারাবে কেন?

বিধায়কের হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল, বলল ঃ আজ এ কথা বুঝবেনা।

স্মিতা আবার একবার পিছন ফিরে তাকাল। তারপরেই থমকে দাঁড়াল পথের উপর। বিধায়কও তাড়াতাড়ি ফিরে দেখল, সেই লোকটা আর বসে নেই। সে অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে। এইতো

একটুখানি পথ, এরই ভিতর একটা গোটা মানুষ অদৃশ্য হতে পারে! স্মিতার বুঝি বিশ্বাস হলনা নিজের চোখকে। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল বিধায়কের দিকে।

বিধায়ক খানিকটা ফিরে গেল। উপরে নিচে চারিপাশে চেয়েও কাউকে দেখতে পেল না! লোকটা গেল কোথায়! একটু আগে যে মানুষটার প্রতি বেদনায় তার মন আর্দ্র হয়েছিল, এখন তাকে রহস্যময় মনে হচ্ছে। সন্দেহ জাগছে নানা রকম। তাদের লক্ষ্য করছেনা তো, নির্জন অরণ্য পথে তাদের অনুসরণ করবে না তো! নানা ভাবনায় বিধায়কের মন ভারাক্রান্ত হল।

সামনে থেকে স্মিতা ডাকল : এস!

উত্তর না দিয়ে বিধায়ক এগিয়ে গেল।

পাঁচ

ডান দিকের সেই মিষ্টির দোকানটির দরজা বন্ধ আছে। ঝাঁপ ফেলা। কিন্তু ভিতরে জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখানে ঝরণা কোথায়? বিধায়ক উঁকি দিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। এক ফালি ফাঁক দিয়ে ভিতরের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার তত ঘন নয়। বিধায়ক স্পষ্ট দেখল, বুড়ো দোকানদার স্নান করছে। বালতির জল ঘটি করে ঢালছে মাথায়। অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে। আর লোকটা বিড়বিড় করে যেন মন্ত্র পড়ছে।

স্মিতা বলল: কী দেখছ?

দেখবে এস।

স্মিতাও অপরিমিত বিস্মিত হল।

এই শীতে কেউ এত ভোরে স্নান করে!

বিধায়ক বলল: করে।

করে!

এই লোকটাই তো করছে। ওর মনে যতদিন ধর্মে বিশ্বাস থাকবে, ততদিন করবে। বাসি কাপড়ে সে উনুন ছোঁবেনা, খদ্দের ওর কাছে দেবতা। স্নান করে ও দেবতার ভোগ রাঁধবে।

স্মিতা হেসে উঠল।

হাসলে যে?

তোমার কথা শুনে। এখনও তুমি সেকেলে আছ।

বিধায়ক বলল: আমি সেকেলেই থাকতে চাই।

কেন বলত?

উত্তরটা আমার নিজের হবেনা।

সনাতনের কথাই বল।

সনাতন বলে যে দ্বন্দ্বটা একালের সঙ্গে সেকালের নয়। দ্বন্দ্বটা ভালোর সঙ্গে মন্দের। সেকাল বলতেই সব ভাল নয়, সব খারাপও নয়। তেমনি একালের কথাও। আমি যখন সেকেলে থাকতে চাই বলি, তখন বিজ্ঞানের দরজা বন্ধ করব ভাবিনা। সেকালকে বাদ দিয়ে যে একাল আসেনি, সেই সত্য সম্বন্ধে সচেতন থাকবার চেষ্টা করি। একটা বিশ্রী কথা বলে। বলে, এটা একটা জারজ যুগ। নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে পাঁচ মিশেলি সভ্যতায় আমরা বর্ণশঙ্কর হচ্ছি।

সনাতন তোমাকে হত্যা করবে।

না। তার বড় নজর। সেদিন সে এই কথা নিজে বলছিল। গোটা সমাজটার গোটা দেশটার গলা টিপে মারতে তার ইচ্ছে করে।

পা টেনে টেনে দুজনে পাহাড়ে উঠছিল। জোরে চলবার চেষ্টা করলে ঘন ঘন বসতে হবে। তাই আস্তে চলা। স্মিতা বলল : তা যখন সে পারবেনা, তখন তোমরাই সাবধানে থেকো।

খানিকটা দূরে দূরে এক একখানা বাড়ি। মানুষের বসতি যেন শেষ হয়েও হচ্ছেনা। নিচের রাস্তা থেকে এ সব দেখা যায়না। যা দেখা যায়, তা রোমশ দৈত্যের মতো। ধূসর পাহাড়ের গায়ে ঝাউএর শ্যামল বন।

স্মিতা বলল : উত্তর দিলেনা যে?

আমি অন্য কথা ভাবছি।

আমার কথা তাহলে শুনতে পাওনি।

পেয়েছি। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিনা।

কেন?

বিধায়ক বলল : সামনে দেখতে পাচ্ছ, দুটো রাস্তা দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকে একটা রাস্তা বেঁকে গেছে। কোনটা সোজা উঠেছে আর কোনটা ঘুরে, এখন আর তা মনে নেই।

তাতে ক্ষতি কী! যে কোন একটা ধরে উঠব, নামব আর একটা ধরে। দুটো রাস্তাই তাহলে দেখা হবে।

রাস্তার মোড়ে পৌঁছে বিধায়ক বলল : চিনেছি।

চিনেছ ?

এই দেখ। এই রাস্তাটা ঘুরে উঠেছে।

কী করে বুঝলে ?

অনুমান কর।

পারছিনে।

বিধায়ক আঙুল দিয়ে রাস্তাটা দেখাল। বলল : কিছু দেখতে পাচ্ছ ?

না।

এই চাকার দাগ ? রিক্সর চাকা।

তা দেখতে পাচ্ছি বৈকি।

তাহলেই বোঝ। এই রাস্তায় যখন রিক্স ওঠে, এটা অবশ্য ঘোরা পথ। বেশি হাঁটতে হবে। আর এই পথ ধরলে সরাসরি ওপরে পৌঁছব।

স্মিতা বিধায়কের বুদ্ধির তারিফ করলনা। খাড়া পথটা ধরে বলল : পেছনে একটু নজর রেখ। সেই লোকটার কথা একেবারে ভুলে গেছ।

সত্যিই বিধায়ক সেই লোকটার কথা ভুলে গেছে। কিন্তু এখন আর ভয় করলনা। আকাশ একেবারে স্বচ্ছ হয়ে গেছে। কোথাও আর অন্ধকার জমে নেই। গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যকিরণের স্রোত দেখা যাচ্ছে। আশে পাশের বনে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েনি, কোথায় পড়েছে তা দেখা যাচ্ছেনা। হয়তো নিচের পাহাড়ে, ফাগলিতে বিধায়কের ঘরের বারান্দায়। স্মিতা তার ক্লোকটা খুলে হাতে ঝুলিয়ে নিল। বিধায়ক বলল : ঠাণ্ডা লাগবেনা তো !

আমরা যে এই দেশের লোক সে কথা ভুলে যাচ্ছ।

বিধায়কের মন আজ তর্কের বেড়া ডিঙিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যুষের এই প্রসন্ন পরিবেশে মন তার মুক্তি পেয়েছে। উপলব্ধির ক্ষেত্রে তর্ক যেমন বাধা, মন জানাজানির সময় ভাষাও তেমনি। বিধায়কের আজ কথা না বলে হাঁটতে ভাল লাগছে।

পায়ে চলা মাটির পথ। ক্লান্তিকর চড়াই। স্মিতা বেয়াড়া ভাবে পথ অতিক্রম করছিল। রাস্তার দক্ষিণ থেকে বামে, আবার দক্ষিণে। পথকে দুপায়ে কেটে কেটে উপরে উঠছে। হঠাৎ বলল ঃ কেন এমন করছি জান ?

জানিনা।

এ ভাবে চড়াই ভাঙতে কষ্ট কম হয়।

বিধায়ক আর কিছু জানতে চাইলনা।

স্মিতা বলল, বৈজ্ঞানিক যুক্তি কিছু আছে ?

তা জানি নে।

বোধহয় নেই। পাহাড়ীদের বিশ্বাস বলে আমিও বিশ্বাস করি।

আরও খানিকটা উঠে বলল ঃ কিন্তু পাহাড়ীদের এ ভাবে পাহাড় ভাঙতে দেখিনি।

স্মিতা আবার আগের মতো সোজা ভাবে উঠতে লাগল। বলল ঃ তাদের মুখেও এ কথা শুনিনি। গত বছর —

স্মিতা দম নিল। বলল ঃ সিমলায় এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। ভারতবর্ষের সমস্ত পাহাড় তিনি দেখেছেন। তাঁর মুখে শুনেছি।

এবারে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দম নিল। তারপর বলল ঃ এবারেও তিনি আসবেন।

অরুণ বাবু ?

ঠিক, তুমি তো চেন তাঁকে।

খানিকটা উপরে একটু সমতল জায়গা দেখা যাচ্ছে। মনে

হচ্ছে পাহাড়ের শেষ ওখানেই। কিন্তু দুজনেই জানে ওখানে শেষ নয়। তবে কষ্টের শেষ ওখানেই। মন্দির পর্যন্ত রাস্তাটা তখন সমতলের মতই মনে হবে। স্মিতা বলল: এই পাহাড়ে ওঠার পাগলামি যে তোমার কেন হল!

বিধায়ক হাসল।

হাসবেই তো। মুখে তো আর কথা আসছেনা, বুকেও দম নেই।

এ কথার উত্তরেও বিধায়ক হাসল।

স্মিতা টলতে টলতে সেই সমতল জায়গাটুকুতে গিয়ে পৌঁছল। বিধায়কও পৌঁছল। ডান হাতে একটা জলের কল আছে। ঝির-ঝির করে জল পড়ছে। স্মিতা বলল: জল খাব।

বিধায়ক বলল: না না, এখন নয়।

আমার ভীষণ গলা শুকিয়ে গেছে।

তার আগে একটুখানি জিরিয়ে নাও। বরং আর একটা লজেন্স খাও।

বিধায়কের পকেটে অনেক লজেন্স ছিল। অনেকবার সে এই লজেন্স বার করে দিয়েছে। আবার দিল।

লজেন্সটা মুখে পুরে স্মিতা বলল: তুমিতো বাঙলা দেশের ছেলে। টাইগার হিলে কখনও উঠেছ?

না।

শুনেছি, টাইগার হিলের শেষ পথটুকুও নাকি এমনই চড়াই।

চল, একবার দেখতে যাব।

স্মিতা বলল: মসুরির গান হিল আর নৈনিতালের চীনা পীকও এমনি।

উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে একটা বেঞ্চি পাতা আছে। পথ ছেড়ে উপরে খানিকটা উঠতে হয়। স্মিতা বলল: এইখান থেকে সিমলার দৃশ্য ভারি সুন্দর, তাই না?

বিধায়ক পশ্চিমমুখো দাঁড়িয়ে নিচের পৃথিবীটা দেখল। বলল: সত্যিই সুন্দর।

অজস্র উদার রৌদ্রে গোটা সিমলা শহর এখন ঝকঝক করছে। পরিচিত জায়গাগুলোকে মনে হচ্ছে রহস্যময়। দুজনে মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল।

আরও খানিকটা এগিয়ে জাকু পাহাড়ের মন্দির। দরজা বন্ধ। দেবতা নাকি প্রাচীন। কিন্তু মন্দিরের গায়ে প্রাচীনতার কোন চিহ্ন নেই। ছোট সামান্য ব্যাপার। কিন্তু এত পরিশ্রমের পর কিছু অসামান্যই মনে হয়। এক জায়গায় মন্দির নির্মাতার নাম ধামও লেখা আছে। লক্ষ্ণৌএর লালা হরকিষণ দাস তাঁর ভাইয়ের স্মৃতিতে নির্মাণ করেছেন উনিশ শো সাতচল্লিশ সালের নভেম্বর মাসে। ঠিক এগারো বৎসর আগে।

স্মিতা বলল: আশ্চর্য, আজ একটা বাঁদরও আমাদের পথ আটকালো না।

বিধায়ক গম্ভীর ভাবে বলল: আশ্চর্য হবার কী আছে! নিজেদের পথ কি ওরা নিজেরা আটকায়!

বলতে বলতেই একদল বাঁদর দেখা দিল একটা ঝাউ গাছের নিচে। একফালি রোদ এসে সেখানে ছড়িয়ে পড়েছে। নিঃশব্দে তারা রোদ পোয়াতে বসল।

বিধায়করা ডান দিকে এগিয়ে গেল। এই খোলা জায়গাটুকু থেকে পাহাড়ের দৃশ্য বড় মনোরম। সম্পূর্ণ তুষার শ্রেণীটা স্পষ্ট দেখা যায়। কোথাও বরফ, কোথাও মেঘ, কোথাও বা দুয়ে মিলে এক মায়াময় রূপ।

একটুখানি পরিষ্কার জায়গা দেখে স্মিতা বসল। বলল: বাঁদর নিয়ে যে রসিকতা করলে তা পুরনো। ডারউইন নামে একজন আদ্যি কালের বুড়ো এই গল্প শুনিয়েছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষদের।

আমার মনে হয় সে থিওরি অব ইভলিউসন তুমি প্রাচীন বলে পড়নি। কাজেই রসিকতার সময় একটু আধুনিক হওয়া দরকার। তোমার সনাতনকেও একথা বলে দিও।

সনাতনকে কেন ?

এই সব কথা সেইতো সারাক্ষণ বলে। আর তোমরা তারই কাছ থেকে শেখ।

সনাতনের ওপর তোমার রাগ দিনে দিনে বাড়ছে দেখছি।

এই জায়গাটায় বসবার কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ ব্যবস্থা করা কিছুমাত্র কঠিন ছিলনা। রাস্তা যখন পাহাড়ের চুড়ো পর্যন্ত পৌঁছেছে, সব কিছুই সেখানে পৌঁছনো চলত। রাস্তার শেষ দিকটা মেরামত হচ্ছে, বোধহয় পাকাও হবে। পথের ধারে খানকয়েক বেঞ্চ পাতা আছে। কিন্তু বড় দূরে দূরে। সেই বেঞ্চে একসঙ্গে দুতিন জন বিশ্রাম করতে পারে। কিন্তু যাত্রীরা দলে দলে ওঠে বলে সবাইকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বিশ্রাম নিতে হয়। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু পাহাড়ের এই চূড়োয় দাঁড়িয়ে বিধায়কের মনে হল, এই সমস্ত জায়গাটা জুড়ে বসবার ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল। নিচের মাটি বড় শক্ত রুক্ষ। যেখানে ঘাস আছে, রাতের শিশির সেখানে শুকোয়নি।

স্মিতা বলল ঃ দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।

বিধায়ক আর ইতস্তত করলনা। তার পাশেই ঝুপ করে বসে পড়ল। বসেই বিধায়ক বিস্মিত হল। তারা উত্তরমুখো বসেছে, হিমালয়ের আকাশ-জোড়া বরফের একেবারে মুখোমুখি। দক্ষিণ মুখে বসতে পারত, কিংবা পূর্বমুখে। তা বসেনি। উপরে উঠেই চোখ জোড়া বুঝি ঐদিকে আটকে গেছে। বিধায়কের মুখে কোন কথা জোগালনা।

স্মিতা বলল ঃ এখানে উঠবার আর একটা সোজা পথ আছে।

সঙ্গোলিতো এরই নিচেটায়, সেখান থেকে শুরু হয়েছে। আমরা সেই পথে এবারে নামব।

বিধায়কের মন অন্যত্র হারিয়ে গেছে। এত বড় আকাশ, এত বড় পৃথিবী। মানুষগুলো বড় হয়না কেন! ঐ বরফের পাহাড়ে নাকি তুষার মানুষ আছে। তাদের চোখে কেউ দেখতে পায়নি, দেখেছে বরফের উপরে তাদের পায়ের বড় বড় ছাপ। তাই দেখেই সবাই বলে, তারা মানুষের চেয়ে বড়। বিধায়কের চেয়ে, স্মিতার চেয়েও। তবু তারা তেমন বড় নয়। আকাশের মতো বড় নয়, বড় নয় এই পৃথিবীর মতো। বিধায়কের হঠাৎ মনে পড়ল, এ সবের চেয়েও বড় মানুষ আছে। আকাশের চেয়ে কেন, ভাবনার কল্পনার চেয়েও বড়। সেই সব মানুষের কথা মনে হলে মনও যে ছোট থাকতে চায়না। কিন্তু সব মানুষ কেন এমন বড় হয়না! কেন হতে চায় না!

স্মিতার দিকে তাকিয়ে বিধায়ক আশ্চর্য হল। এত বড় পাহাড়ের উপর এই ছোট মেয়েটাকে ঠিক মানাচ্ছেনা। তাড়াতাড়ি নিজের দিকে তাকিয়েও তার এই কথাই মনে হল। তাদের আরও অনেক বড় হওয়া উচিত ছিল।

ফ্লাস্কের ঢাকা খুলতে খুলতে স্মিতা বলল : কী ভাবছ বলত?

ভাবছি!

বিধায়ক চমকে উঠল।

ভাবছই তো!

তা হবে।

স্মিতা চমকে বিধায়কের মুখের দিকে তাকাল। এই লোকটা তো ঠিক এমন ছিলনা! চা ঢালা বন্ধ করে বলল : কী ভাবছিলে তোমাকে বলতে হবে।

বিধায়ক আর আপত্তি করলনা। বলল : আমাদের বড় ছোট মনে হচ্ছে।

কেন ?

তাইতো বুঝতে পাচ্ছিনা।

স্মিতা কী বুঝল সেই জানে। ফ্লাস্কের ঢাকনায় খানিকটা চা এগিয়ে দিয়ে বলল : নাও।

কাগজের একটা মোড়ক থেকে স্যাণ্ডুইচও বার করল।

বিধায়ক চা না নিয়ে স্যাণ্ডুইচ নিল। বলল : তুমি আগে নাও, তোমার তেষ্টা পেয়েছে।

স্মিতা প্রতিবাদ করলনা।

এক সময় বিধায়ক বলল : জান, ছেলেবেলায় স্যাণ্ডুইচ কী আমরা জানতুম না। পাঁউরুটি দেখেছি শহরে এসে।

তারপর নিজের পোষাকের উপর একবার চোখ বুলিয়ে হাসল।

স্মিতা এ কথা মেনে নিল। বলল : মা-ও একদিন এই কথা বলছিলেন, সিমলায় এসে তাঁর জীবনটা নাকি পাল্টে গেছে।

বলেই সে হেসে উঠল। অজস্র কৌতুকের ইঙ্গিত সেই হাসিতে।

অপ্রতিভ ভাবে বিধায়ক বলল : হাসছ যে !

মাকে এই কথা জিজ্ঞেস ক'রো।

পাহাড় থেকে নামবার আগে বিধায়ক জানতে চাইল একটা আশঙ্কার কথা। বলল : চোপরা সাহেবের বাড়ি তুমি যাবে ?

কেন যাবনা !

না না, বারণ আমি করছিনা। শুধু জানতে চাইছি।

কিন্তু তার উদ্বেগের আভাষ পাওয়া গেল প্রশ্নের উত্তরে। সনাতনের সতর্ক বাণী তার মনে পড়ে গেছে। কাল বিকাল বেলাতেই সে বলছিল অ্যালানডেলের ময়দানে দাঁড়িয়ে স্মিতা চোপরা সাহেবের সিমলার সমাজ দেখছে। একবার উঠে দেখে নিক। পা যদি না ফস্কায়, বিধায়ক সুখী হতে পারবে। আর ফস্কালেও তার দুঃখ

নেই। সারাজীবন তাকে আপশোস করতে হবেনা। স্মিতার দিকে তাকিয়ে বিধায়কের মনে হল, তার পা ফস্কালে আপশোস তাকে করতেই হবে। ধাক্কাটা তো দেহে লাগবেনা যে হাত বুলোলেই ব্যথা যাবে, ধাক্কা যেখানে লাগবে হাতের ছোঁয়া সেখানে পৌঁছবেনা।

স্মিতা বলল ঃ তোমাকে একটু উদ্বিগ্ন দেখছি।

ঠিকই দেখছ।

কাল তুমি আত্মসম্মানের কথা বলছিলে। তারই সঙ্গে একটা নোংরা কথা বলেছিলে সনাতনের মতো। সেও তো যাচ্ছে শুনছি।

তোমার সঙ্গেই তবলার সঙ্গত করবে।

তার দরকার খুব বেশি নেই।

বিধায়কের মুখে একটা কঠিন কথা এসে গিয়েছিল। বলতে যাচ্ছিল, খেমটার সঙ্গে তবলা যে অপরিহার্য। কিন্তু তা পারলনা। সামনের আকাশ আর বরফের দিকে চেয়ে সে যেন আবার সব ভুলে গেল। এত বড় আকাশের নিচে বসে এত ছোট কথা কিছুতেই বলা যায়না। এত ছোট কথা বুঝি ভাবাও যায়না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ঃ সেই গানটা একবার গাইবে?—তুমি আমায় গান গাহিতে বল।

স্মিতা আপত্তি করলনা। গুণ গুণ করে গাইল।

বিধায়ক চারিদিকে চেয়ে বলল ঃ এখনও কেউ আসেনি। একটু জোরে জোরে গাও।

স্মিতা জোরে জোরেই গাইল ঃ

আমি থাকি দূরের পানে চেয়ে,
ভাবনা আমার পরান গেছে ছেয়ে,
শুধু গান কেন, শুধু প্রাণ কেন,
তুমি সব নাও।

উচ্ছ্বসিত ভাবে বিধায়ক বলে উঠল ঃ   আবার আবার !

গাইতে গাইতেই স্মিতা তার মুখের দিকে তাকাল। লোকটা সত্যিই শুনতে চাইছে। কিন্তু এই শোনার পিছনে বুঝি কোন বেদনা আছে প্রচ্ছন্ন হয়ে।

গান শেষ হবার আগেই বিধায়ক বলে উঠল ঃ আজ তুমি আমাকে শোনাও, আজ তুমি থেমে যেওনা।

দূরের দিগন্তে বরফের রেখা এখনও একটুও ম্লান হয়নি।

ছয়

চোপরা সাহেব ভেবেছিলেন, ছেলেকে আনবার জন্য তিনি কালকাতেই নামবেন। পথ এমন কিছু বেশি নয়। ষাট মাইল পথ, মাঝখানে আঠারোটা স্টেশন। যানবাহনও নানারকম। মোটর বাস আছে, আছে ট্রেন আর রেল-কার। ট্রেনে ঘণ্টা সাতেক লাগে, কিন্তু রেল-কারে সাড়ে চার ঘণ্টা। ছোট একখানা বাসের মতো গাড়ি, তার লোহার চাকা। রেল লাইনের উপর দিয়ে গড় গড় করে চলে। ড্রাইভারকে মোটর চালক বলেই ভ্রম হবে। কিন্তু এই গাড়ি সকলের জন্য নয়। এআর কণ্ডিসণ্ড্ শ্রেণীর যাত্রীরা এতে চাপে। প্রথম শ্রেণীর চেয়েও কিছু ভাড়া বেশি। জুনিয়ার চোপরা এই গাড়িতে চেপে সিমলার পাহাড়ে উঠল।

চোপরা সাহেব সস্ত্রীক এসেছিলেন ছেলেকে অভ্যর্থনা করতে। সিমলার ওয়েটিং রুমে অনেক সময় কাটিয়েছেন এবং প্ল্যাটফর্মের উপর পায়চারি করেছেন তার চেয়েও বেশি সময়। রেলকার তাঁদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। চোপরা দম্পতি গাড়ির পিছনে ছুটলেন।

হাতে কোট নিয়ে জুনিয়ার চোপরা গাড়ি থেকে নামল। টাই-এর উইণ্ড্সর নটটা আলগা করে কতকটা স্বগত ভাবে বলল: হাউ অফুলি ক্লোজ!

হন্ত দন্ত ভাবে চোপরা দম্পতি কাছে এলেন। একে উদ্বেগ, তার উপর ওভারকোটের ভার। মনে হচ্ছিল দুজনেই হাঁপাচ্ছেন। মিসেস চোপরা তাড়াতাড়ি একবার গাড়ির ভিতরটা দেখে নিলেন। আরও কেউ নামছে কিনা। আরও অনেকে নেমেছে ও নামছে। কিন্তু নিজের ছেলের সঙ্গে আর কেউ নামলনা। মনে মনে মিসেস

চোপরা যে কত বড় তৃপ্তি পেলেন তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল। নিজের অজ্ঞাতে তাঁর হাত দুটো কপালের কাছেও খানিকটা উঠল।

মায়ের গালে একটা চুমু খেয়ে জুনিয়ার চোপরা বলল: ভাল আছ তো মা?

তারপরেই সিনিয়ারের দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল। মাত্র তিনটি আঙুল। সিনিয়ার তাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলেন। ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করে জুনিয়ার বলল: থ্যাঙ্ক্ গড্, উই আর নট ইন ওআটারলু।

মায়ের দিকে ফিরে বলল: এই গরমে তোমরা কী করে থাক?

সিনিয়ার একটু আশ্চর্য হলেন। বেলা এখন দুপুর হতে পারে, কিন্তু পাহাড়টাতো সাত হাজার ফুট উঁচু, মাসটাও অক্টোবর। এই শীতের দেশে যদি ছেলের গরম করে, তাহলে সমতলে নামবে কী করে! বললেন: অভ্যাস হয়ে গেছে।

মিসেস চোপরা কিন্তু নিজের ওভারকোটটা খুলে ফেললেন। বললেন: আজ বেশ গরম বোধ হচ্ছে।

জুনিয়ার তার সার্টের আস্তিন তুলে হাতখানা দেখবার চেষ্টা করল। ঘামাচি বা ফোস্কা বেরিয়েছে কিনা। বলল: রাস্তায় যা দুরন্ত গরম পেলাম, গায়ে ফোস্কা বেরিয়ে থাকলেও বোধহয় আশ্চর্য হবনা।

ইংরেজীতেই কথা হচ্ছিল। সিনিয়ার কিন্তু আশ্চর্য হলেন। বলতে যাচ্ছিলেন: গরমে কি—

কথার মাঝখানেই জুনিয়ার ঘাড় ঝাঁকিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যে তিনি থেমে পড়লেন। জুনিয়ার বলল: এই তো সেবারে ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে উড়ে মোনাকোয় নেমেই দেখি আমার সারা গায়ে ফোস্কা পড়েছে।

মিসেস চোপরা হিন্দীতে বললেন: আমাদের লালের মেয়ে সিমলাতে গরমটা কাটিয়ে দিল্লীতেই ফোস্কা নিয়ে নামল।

জুনিয়ারের সঙ্গে একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ। গাড়ির ভিতর থেকে সেটি সংগ্রহ করে বলল: ইজ্ দেয়ার এনি পাব্ অ্যারাউণ্ড্? গলাটা একেবারে শুকিয়ে উঠেছে।

বলে আবার চারিদিকে তাকাল।

পাব্!

সিনিয়ার আশ্চর্য হলেন।

ছেলে বলল: পাব্লিক বার।

উত্তরে সিনিয়ার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মিসেস চোপরা বললেন: বাড়ি চল।

নো পাব্! জুনিয়ার মন্তব্য করল: হোয়াট এ পিটি!

চোপরা সাহেব ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন। তিনখানা রিক্সকে তাঁর বলা ছিল। যে রিক্সয় তাঁরা এসেছিলেন, তারাই অপেক্ষা করছিল। রিক্সয় না চেপে তাঁদের উপায় নেই। স্টেশন থেকে ব্রিজে তাঁরা উঠতে পারবেননা। ব্রিজ পেরিয়ে লক্কড় বাজার। মিসেস চোপরা বেশি দুর্বল, চলতে ফিরতে বুক কাঁপে। আর মিস্টার চোপরার ভারি দেহ, বইবার জন্য নিজের পা দুখানা যথেষ্ট নয়। রিক্সর কাছে পৌঁছে জুনিয়র হেসেই আকুল। এতে চড়তে হবে! হাউ ফানি!

বলেই সে রিক্সয় লাফিয়ে উঠল।

সিনিয়রও উঠে বসেছিলেন। দাঁড়িয়ে থাকতে বোধহয় তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। মিসেস চোপরা বললেন: দেখলে তো, আমি তোমায় গাড়ি আনতে বলেছিলাম। দিল্লী থেকে কারে এলে আজ এত কষ্ট করতে হতনা।

তা তো বলেছিলে, কিন্তু গাড়িখানা রাখতাম কোথায়! নিজের বাড়ি পর্যন্ত তো গাড়ি আসবেনা!

বাড়ি পর্যন্ত আসবার দরকার কী! কত লোকেই তো এনেছে।

সিমলায় সত্যিই অনেকে গাড়িতে আসে। দুএকটা হোটেলে গাড়ি পার্ক করবার জায়গা আছে। আর কয়েকটা জায়গায় পাহাড়ের গায়ে গাড়ি রাখা যায়। কোন ক্ষেত্রে হয়তো অনুমতির দরকার আছে। কিন্তু চোপরা সাহেবকে সে অনুমতির জন্য বেগ পেতে হতনা।

জুনিয়ার চোপরা রিক্সয় বসে পকেট থেকে পাইপ বার করল। সেই সঙ্গে তামাকের পাউচ। উইথ ইয়োর পার্মিশন ড্যাড্ বলে মায়ের মুখের দিকে চেয়েই পাইপটা সাজিয়ে মুখে পুরল। আগুন দেবার জন্য আর বাপ মায়ের অনুমতির অপেক্ষা করলনা।

মিসেস চোপরা রিক্সয় চেপে বললেন ঃ চল।

সিনিয়র চোপরা তখন অনেকটা এগিয়ে গেছেন।

মিসেস চোপরার অনেকদিন আগের ঘটনা মনে পড়ল। তিরিশ বছর হতে বোধহয় এখনও বছর দুই বাকি আছে। তাঁর নিজেরও তখন কুড়ি বছর বয়স হয়নি। মুন্না কোলে এল। সে সব দিনের কথা ভাবলে এখনও তাঁর ভয় করে। এখনও তিনি শিহরে ওঠেন।

সেই মুন্না আজ এত বড় হয়েছে। এখন আর তাকে কেউ মুন্না বলে না। এখন তার মনোহর নাম। স্কুলে সে ভাল ছেলে ছিলনা। কলেজে সে ফেল করেছে। মিস্টার চোপরা জানতেন যে তার মন খারাপ। তাই একটু বেশি শাসন করতেন। মিসেস চোপরা বলতেন, দেশে ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। তাই বিদেশে পাঠানো দরকার। মনোহর নিজেই চাইত বিদেশ যেতে, মাকে ধরত। বাপ রাজী হতেন না। যে ছেলেকে চোখের সামনে সামলাতে পারছেননা, তাকে বিদেশে কী করে সামলাবেন! মিসেস চোপরা ভোলেননি যে মিস্টার চোপরা সেদিন রাজী হয়েছিলেন তাঁরই কথায়, তাঁরই কান্নায়। স্ত্রীর কথা ফেলতে পারেননি বলেই তিনি ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছেন, আর এই দীর্ঘ আট দশ বছর ধরে

নিয়মিত অর্থ জুগিয়েছেন। পরিমিত অর্থ নয়, তাঁর নিজের উপার্জনের মতোই প্রচুর অর্থ। এ দেশের সাধারণ ছেলে হলে এই টাকায় কয়েকটা ছেলে মানুষ হয়ে ফিরত। মোটা টাকার জন্যে 'তার' এলে মিস্টার চোপরা এই সব কথা বলতেন। ছেলে কী শিখে এল, মিসেস চোপরা এখনও তা জানেননা। এতক্ষণ কেন জিজ্ঞাসা করেননি, সেই কথা তাঁর মনে এল। সাহস হয়নি, না মুখে আটকে গেছে! হয়তো সে কিছুই শিখে আসেনি। প্রশ্ন করলে বিব্রত বোধ করত। ভালই হয়েছে কিছু জানতে না চেয়ে।

কিছু শেখেনিই বা কোথায়! মিসেস চোপরা ভাবতে লাগলেন। বিলেত যাবার আগে ছেলেকে পাইপ টানতে দেখেননি। মুখ ফেরালেই এখন তা দেখতে পাবেন। তারপর 'পাবের' কথা জিজ্ঞাসা করছিল। পাব্ তিনি দেখেননি। পাব্ মানে বুঝি পাবলিক বার। বারে তো মদ খায়! ক্লাবের বার থেকে মিস্টার চোপরাকেও এক একদিন টেনে আনতে হয়। গাড়িতে তুলতে হয় ধরাধরি করে। বিলেতের শুঁড়িখানাকে বুঝি পাব বলে?

মিসেস চোপরা তাড়াতাড়ি অন্য কথা ভাববার চেষ্টা করলেন। এসব কথা ভাবতে তাঁর বড় কষ্ট হয়। বছর তিরিশেক আগেও হত। পৃথিবীটা কি বদলাবে না!

আচ্ছা, মিস্টার চোপরা আজ কী ভাবছেন? মিসেস চোপরা তাঁর স্বামীর ভাবনার কথা ভাবলেন। ছেলের সম্বন্ধে তাঁর অনেক আশঙ্কা ছিল, অনেক ভয়। ছেলেকে দেখে আজ তিনি কী ভাবছেন! মিসেস চোপরা কিছু সন্দেহ করতে পারেন। তাঁর রিক্সটা সকলের আগে চলেছে। পাশে থাকলে জিজ্ঞাসা করা চলত। কিন্তু উত্তর কি তিনি দিতেন? আজ তাঁকে বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে যেন। বড় কম কথা বলছেন। অন্য দিনতো তিনি এমন চুপ করে থাকেন না!

কিন্তু মিস্টার চোপরার খুশী হওয়া উচিত ছিল। তিনি যে

সন্দেহে কণ্টকিত ছিলেন, তাতো সত্য হলনা। মনোহর একা ফিরেছে। এমন কিছু সঙ্গে করে আনেনি, যা ত্যাগ করা চলেনা। অভ্যাস তো দেহের অঙ্গ নয় যে কেটে বাদ দেওয়া যায়না, শৈশবের সব অভ্যাস যদি পালটে থাকে তো যৌবনের অভ্যাসও পালটাবে। মনোহরের কাছে তাঁর এখনও অনেক আশা আছে।

মিস্টার চোপরা তাঁর নিজের যৌবনের কথা ভাবছিলেন। না না, এ বয়সে আর ও সব কথা ভাবা উচিত নয়। লজ্জা করে ভাবতে। তার উপর সেই বোঝাটা। সে পাপের কি কোনদিন ক্ষয় হবেনা! চিরদিন সেই ভার বইতে হবে! কে জানে, এ হয়তো তাঁর শাস্তির সময় চলেছে। তা না হলে তাঁর একটি মাত্র ছেলে আজ এমন হয়ে ফিরবে কেন!

বাপের সঙ্গে মদ খাবার কথা তাঁর মনে পড়েনা। খেতেন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে। নেশা হলে লুকিয়ে বাড়ি ফিরতেন, কিংবা ফিরতেনও না। কিন্তু বাপের সামনে মাতলামি কোনদিন করেননি। করবার সাহস তাঁর ছিলনা। তিনি তাহলে নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দিতেন। একবার সাক্সেনাকে দেখেছিলেন তার নিজের বাপের সামনে মদ খেতে। কী একটা উপলক্ষ্যে সে বন্ধুদের নেমন্তন্ন করেছিল। তাঁরা কয়েকজন গিয়েছিলেন। সাক্সেনা তার বাপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তখন টেবিলে মদ পরিবেশন হচ্ছে। সেদিন এই ঘটনাটা মিস্টার চোপরার কাছে বিসদৃশ ঠেকেছিল। ভালও লেগেছিল। যে কাজ করতেই হবে, তা চোরের মতো কেন করবেন। সংস্কারের আড়ালটা ভেঙে গেলে সংসারে সুখী হবার সুযোগ আসবে।

কিন্তু আজ তাঁর অন্য কথা মনে হচ্ছে। স্বেচ্ছাচারের সুখতো সাময়িক, সারা জীবন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত। নিজের জীবনেও অনেক সময় শেষ হয়না। উত্তর পুরুষের জন্যও অনেক শাস্তি রেখে

যেতে হয়। মনোহর আজ তাঁকে এই নিষ্ঠুর সত্যের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। তার জীবনের শুরু যে ভাল হয়নি, তাতে সন্দেহ নেই। মনোহর এ কথা আজ বুঝবেনা। বোঝাতে গেলে সে ভুল বুঝবে। তিনি নিজেও তাঁর বাপকে ভুল বুঝতেন। সেকেলে ভাবতেন, কনজারভেটিব ভাবতেন। ভাবতেন, সভ্যতাকে তাঁরা পিছন থেকে টেনে রেখেছেন, দেশটাকে এগোতে দিচ্ছেননা। পৃথিবীর সভ্যতা যখন নিজের ভারে গড়িয়ে যাচ্ছে, এ দেশের কতগুলো ভীরু মূর্খ অকারণে বাধার সৃষ্টি করছে। মিস্টার চোপরা নিশ্চিত জানেন যে মনোহর আজ তাঁর সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই ভাবছে। এর জন্য তাঁর দুঃখ নেই। এই জগৎটাকে তিনি সাতান্ন বছর ধরে দেখছেন। মনোহরের বয়স সাতান্ন হলে সে নিজেই তার ভুল বুঝতে পারবে। তখন সেও তার ছেলের সম্বন্ধে এই কথাই ভাববে।

কিন্তু এই বিশ্বাসে যে সান্ত্বনা নেই! চোখের সামনে ছেলেটা বয়ে গেলে লোকে যে তাঁকেই দায়ী করবে। পিতার কর্তব্যে ত্রুটি ছিল, আর দায়িত্ব উদ্‌যাপনে ব্যর্থ হয়েছেন, এ কথা মন্তব্য করতে কেউই দ্বিধা করবেনা। কিন্তু তিনি কী করতে পারতেন! চোখের সামনে ছেলেকে বাঁধতে পারেননি। ভেবেছিলেন, অবাধ স্বাধীনতায় হয়তো মতি ফিরবে। অনেকেরই তাই হয়। বাধা যত বেশি, পাবার লোভও তত তীব্র। বাধা সরিয়ে নিলে হয়তো একবার হাবুডুবু খেতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু তার পরে আর সে লোভের চিহ্ন থাকেনা। কিন্তু মনোহরকে দেখে তাঁর মনে হচ্ছে, একটা উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে সে এখনও সত্য ভাবছে। সভ্যতার পঙ্কে এমন দীর্ঘদিন ডুবে থেকেও কি তার সত্যোপলব্ধি হল না!

মিস্টার চোপরার মনে হচ্ছে, ছেলে কিছুই শিখে আসেনি। চাল চালিয়াতি শেখা তো আর শেখা নয়, যে বিদ্যা শিখে আসলে দু পয়সা ঘরে আনা যায় তারই নাম শেখা। সে যদি কিছু শিখেই

থাকবে, তাহলে চিঠিতে সে কথা জানাত। লেখাপড়া শিখে ছেলে মানুষ হয়েছে, এ কথা শুনলে কোন্ বাপ মায়ে না সুখী হয়! আর কোন্ ছেলে একথা না জানে! মনোহরও নিশ্চয়ই জানত। কিছু শিখছেনা বলেই লেখা পড়ার কথা সে সযত্নে এড়িয়ে যেত।

মিস্টার চোপরা একবার রাস্তার দিকে তাকালেন। আর অল্প পথ বাকি আছে। স্টেশন থেকে কার্টরোড, তারপর কোনাকুনি মল রোডে এসে পৌঁছেছেন। এইবারে রিজ পেরলেই লক্কর বাজার। একটুখানি নামতে হবে। মিস্টার চোপরার মনে হল, রিক্সওয়ালারা বড় তাড়াতাড়ি রিক্স টানছে। এই পাহাড়ের খাড়া পথে তাঁর মতো ভারি সওয়ারি নিয়ে এমন ছুটতে তারা কী করে পারে! নিজের কর্তব্যের কথা তাঁর মনে পড়ে গেছে। ভেবে রেখেছিলেন যে ছেলেকে দেখবার পর নিজের কর্তব্য তিনি রিক্সয় বসেই স্থির করে ফেলবেন। পিতার কর্তব্য বড় দায়িত্বপূর্ণ। ছেলে ভাল হলে ছেলেই রত্ন, খারাপ হলে পিতা অমনোযোগী। এত বড় ছেলে শাসন করা যায়না। অথচ তাকে নিজেদের মনোভাব বুঝিয়ে দিতে হবে। মনোহরকে তিনি বন্ধুর মতো সদয় ভাবে গ্রহণ করবেন, না গম্ভীর থেকে তাঁর বিরাগ জানাবেন, সে সম্বন্ধে কিছু স্থির করে ফেলা দরকার। রিক্স থেকে নামলে আর তার অবকাশ পাবেননা। তখন নানা কাজ। মালিকে স্টেশনে পাঠাতে হবে। মেল ট্রেনে মনোহরের জিনিস পত্র আসবে, সে সব ছাড়িয়ে আনতে হবে। বেলাও বেড়েছে অনেক। ক্ষিধেও পেয়েছে।

বন্ধুর মতো সহজ ভাবে ছেলেকে গ্রহণ করলে কী ক্ষতি আছে? ছেলে তো সাবালক, তাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখবার আর কী দরকার? নিজের দায়িত্ব সে যদি না বোঝে, তাহলে কী দরকার তাকে জোর করে কিছু বোঝাবার! হঠাৎ তাঁর মনে হল, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। স্ত্রীর মতামতটা জেনে নেওয়া হয়নি। তিনিই

তো তাঁকে সকলের আগে দায়ী করেন। বাইরের লোক তাঁর কাজের সমালোচনা ঠিকই করবে, কিন্তু কৈফিয়ৎ চাইতে আসবেনা। কৈফিয়ৎ যিনি সারাক্ষণ চাইবেন, তিনি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলেছেন। রাত্রে তো চেপে ধরবেনই, দিনের বেলাতেও একটু আড়ালে পেলে নিষ্ঠুর ভাবে জবাবদিহি করাবেন।

মনোহর চোপরা ভাবছিল গতির কথা। আজকের এই শতাব্দীতেও এই সব যানবাহান এ দেশে চলে! হাউ শ্লো! হাউ ডিসগ্রেসফুল! বুড়োরও বুদ্ধি তেমনি! এত জায়গা থাকতে বাড়ি কিনেছেন এমন জায়গায় যে কয়েকটা পাহাড়ীর হাতে এমন ভাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই। বিরক্তভাবে প্রশ্ন করল : ওন্ট ইউ স্টপ?

উত্তর কে দেবে! যে লোকটা সামনে টানছিল, সে একবার পিছন ফিরে দেখল। কোন কথার যে উত্তর দিতে হবেনা, এরা তা বোঝে।

রাস্তার ধারের দোকানগুলো মনোহর ভাল করে দেখছিল। দোকানের সাইনবোর্ডগুলোও। দেখে দেখে বিরক্তও হচ্ছিল। দেশটা এখনও এত পিছিয়ে আছে! চা আর কফি খেয়েই লোকগুলো জীবন কাটাবে! সন্ধ্যেবেলায় এরা কী করে! বাড়িতে বসে থাকে! মনোহরের মনে হল, এদের সবাইকে একবার পৃথিবীটা দেখিয়ে আনা দরকার। চোখ না ফুটলে এরা বাঁচতে শিখবেনা। এরা যে মরে আছে, এটুকু অন্তত জানুক।

মনোহর ভুলতে পাচ্ছেনা বে বিলেতের সমস্ত লোক বাঁচে সন্ধ্যেবেলার জন্য। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঐ সময়ের লোভে। ঐ সময়ে তারা পরদিনের জন্য জীবন-শক্তি সঞ্চয় করে। এক একটা রাত, মনোহরের মনে হল, অমন রাতের আস্বাদ কি এদেশে কখনও পাবে! বুড়ো বুড়ি এ সব বুঝলনা। ওঁরা শুধু মাথার দিব্বি দিতেই পারেন। আর পারেন টাকা বন্ধ করার ভয় দেখাতে।

জানেননা যে বিলেতে টাকা ছড়ানো আছে। কুড়োলেই হল। টাকা বন্ধ হবার ভয়ে মনোহর ফেরেনি।

মনোহর হঠাৎ দেখতে পেল, একটা লোক তাকে লক্ষ্য করছে। স্ক্যাণ্ড্যালপয়েন্টের কাছে একটা দোকানের ছায়ায় পিছন মুখো দাঁড়িয়েছিল। সামনের দুখানা রিক্স এগিয়ে যেতেই ঘুরে দাঁড়াল। চোখে কালো চশমা, মাথার টুপি চোখ পর্যন্ত নামানো। গায়ে একটা মোটা ওভারকোট আছে। তার কলার নাক পর্যন্ত তুলে দিয়েছে। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখেই মনোহরের মনে হল, লোকটা তাকেই দেখছে পুলিসের মতো সন্ধানী চোখে। পুলিসকে মনোহর ভয় পায়। বিলেতের পুলিসরা বড় সাংঘাতিক জিনিস। ওদের টেডি বয়গুলো কী কাজ না পারে, কিন্তু পুলিসের নামেই একেবারে লক্ষ্মী ছেলে। কাছে একটা পুলিস এসে দাঁড়ালে, একদল টেডি বয় নিঃশব্দে বেরিয়ে যাবে সুড় সুড় করে। এও কি পুলিস নাকি! এদেশে নাকি পোষাকহীন পুলিশও আছে। মনোহর মুখ ফিরিয়ে পাইপ টানতে লাগল। ধোঁয়া অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। সে কথা তার মনে পড়ল না।

রিজের উত্তর পূর্ব কোন থেকে বেরিয়েছে সঞ্জৌলির রাস্তা। প্রথমে লক্কর বাজাড়, সঞ্জৌলি অনেক দূর। পাইপে আর একবার আগুন দেবে কিনা মনোহর ভাবছিল। চমকে উঠল পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে।

আরে চোপরা যে!

রোকো রোকো।

মনোহর লাফিয়ে নামল।

একজন সুদর্শন যুবক এগিয়ে এসে মনোহরের হাত চেপে ধরল। গভীর ভাবে নাড়া দিয়েই ধরে রইল। মনোহর বলল: সেন তুমি এখানে?

বেড়াতে এসেছি।

এই সময়েই একটি সুশ্রী মেয়ে সেনের পাশে এসে দাঁড়াল। সেন বলল: স্ত্রীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই এস।

নিজের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল: আমার বিলেতের বন্ধু।

গদ গদ ভাবে মনোহর তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মিসেস সেন তার হাত জুড়ে নমস্কার করল।

মনোহরকে তার হাত গুটিয়ে নিতে হল তৎপর ভাবে। বুক পর্যন্ত হাত তুলে সেও নমস্কার করল।

কথা ইংরেজীতেই হচ্ছে। সেন জিজ্ঞাসা করল: কবে ফিরলে?

এইতো ফিরছি।

মানে?

চণ্ডীগড় এসেছি প্লেনে। তারপর ট্রেনে। হোয়াট্ এ জার্নি।

উত্তরে সেন হাসল।

মনোহর বলল: অতগুলো লাঠি কেন?

মিসেস সেন লজ্জা পাচ্ছিল, কিন্তু সেন পেলনা। বলল: দেখছনা, লক্কড় বাজার থেকে ফিরছি। দেশে দুটো বুড়ো আছেন দুজনের বাবা, আর তাঁদের বন্ধু বান্ধব।

মিসেস সেনের হাতেও খবরের কাগজ মোড়া একটা প্যাকেট ছিল। সেটা দেখিয়ে বলল: ওর ভেতর আছে নারকেলের অ্যাসট্রে, পাহাড়ি কাঠের ওপর বসানো বেশ জিনিস। যাবার সময় দেখে যেও।

আস্তে আস্তে মিসেস সেন বলল: ওঁরা বুঝি—

সেন ভারী লজ্জিত বোধ করল, বলল: তোমায় আটকে ভারি অন্যায় করলুম।

মনোহরও চমকে উঠে দেখল রিক্স দুখানা অনেক এগিয়ে গেছে। তাঁরা তাকে থামতে দেখেননি। তবু বলল: কিছুনা, কিছুনা।

বলেই রিক্সয় আবার লাফিয়ে উঠল। প্রশ্ন করল: কোথায় উঠেছ।

সেন বলল: মেরিনা হোটেলে। ক্লার্ক্সের কাছাকাছি।

যাবার আগে মনোহর বলল: আসব সন্ধ্যে বেলায়।

হাত নেড়ে জানাল: বাই বাই!

রিক্সওয়ালা তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ছিল। তাইতেই তাঁদের ধরে ফেলা সম্ভব হল। লক্কড় বাজারের ভিতর থেকে যে রাস্তা লংউড পাহাড়ের দিকে গেছে, সেই রাস্তা ধরে একটু খানি এগিয়েই থামতে হয়। বাঁহাতে আর একটা ছোট পথ। রিক্স চলেনা, মোটর তো নয়ই। সেই রাস্তা ধরে খানিকটা নামলেই মিস্টার চোপরার বাড়ি। রিক্স থেকে নেমে চোপরা দম্পতি ছেলের অপেক্ষা করছিলেন। মনোহর কাছে আসতেই মিসেস চোপরা বললেন: দেরি হল যে!

মিস্টার চোপরা ভাড়ার পয়সা মিটাচ্ছিলেন। মনোহর বলল: সেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে বিয়ে করেছে। ছ্যাট ফুল অব এ ফেলো।

মিসেস চোপরা সেনকে চেনেননা। তবু বললেন: সত্যি নাকি!

ভারি কিপ্টে ছিল। কোনদিন কাউকে কোন ড্রিঙ্কস্ অফার করেনি। একটা মেয়েকেও না।

কী করেছে?

দু হাতে রোজগার করেছে আর জমিয়েছে। বলত ঐ টাকা দিয়ে কন্টিনেন্ট যাবে।

আর বাড়ির টাকা?

বাড়ির টাকা আর কজনের আসত! চাল দেখাত চাকরির টাকায়!

মিস্টার চোপরার সঙ্গে রিক্সওয়ালাদের তখন বচসা শুরু হয়ে গেছে। ভাড়ার টাকা নিয়ে বচসা। স্টেশনে অতক্ষণ তারা অপেক্ষা

করেছে, তার জন্যও কিছু চাই। তারপর বকসিস। এমন বড় লোকে যদি না দেন তো কে দেবে!

ছিছি, টিপ্‌স্ দাওনি: মনোহর এগিয়ে গেল: বেশি না দাও, এক এক শিলিং করে দিয়ে দাও।

মিস্টার চোপরা কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন ছেলের দিকে। গাছ ঝাঁকালেই পয়সা পড়ে কিনা যে এমন করে ছেটাতে হবে! স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে মিসেস চোপরা একথা বুঝতে পারলেন। তাড়াতাড়ি ছেলেকে বললেন: চল চল, আমরা এগিয়ে যাই।

নীচের পথ ধরতেই ছেলে বলল: আবার নামতে হবে?

বেশি নয়, একটুখানি। ঐতো দেখা যাচ্ছে!

ঐ বাড়ি!

মনোহর নাক সেঁটকাল।

মিসেস চোপরা তাড়াতাড়ি বললেন: মন্দ নয়, ছোটর ভেতর বাড়িটা ভাল।

উপর থেকে মিস্টার চোপরার গলা শোনা যাচ্ছে। তিনি ভীষণ চটেছেন। মিসেস চোপরা দাঁড়িয়ে একবার পিছন ফিরে দেখলেন। লোকটা হাত-পা না ছোঁড়ে। রিক্সওয়ালারাও সংখ্যায় অনেকগুলো। ভয়ে ভয়ে মিসেস চোপরা বললেন: যা চায় দিয়ে চলে এসনা, কেন গোলমাল করছ!

ছেলে এসেছে বলেই বোধ হয় মিস্টার চোপরা এ কথা মেনে নিলেন। কিছু খুচরো পয়সা তাদের দিকে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন: এই নাও। মানুষকে তোমরা লুটে খাবে।

বিরক্ত ভাবে মনোহর বলল: এই পাড়াটার নাম কী?

এই পাড়ার নাম মিসেস চোপরা উত্তর দিলেন: লক্কড় বাজারই তো বলে।

লক্কড় বাজার!

ছিছি, এমন জায়গায় কেউ বাড়ি কেনে!

কেন, জায়গাটা তো খারাপ নয়! বেশ খোলা মেলা, দুপুর থেকেই রোদ ঝকঝক করবে পিছনের বারান্দায়!

তা করবে, কিন্তু লোককে ঠিকানা বল কী করে?

মিসেস চোপরা কথাটা ঠিক বুঝতে পারলেননা। বললেন: তার অসুবিধা কী! লক্কড় বাজার সিমলার তীর্থস্থান। কিছু না হোক একগাছা লাঠির জন্যে অন্তত আসতেই হবে।

মিস্টার চোপরা ষ্টীম রোলারের মতো গড়িয়ে নামলেন। বাড়ির দরজায় পৌঁছে হাঁক দিলেন: মালি মালি!

কণ্ঠ সুললিত নয়। দরজা জানালাগুলোও বোধহয় ঝনঝন করে কেঁপে উঠল।

মিসেস চোপরা বললেন: অমন চেঁচাচ্ছ কেন?

না চেঁচিয়ে আর উপায় কী বল! এত করে বলে রাখলাম যে বাইরে থাকবি, তা সময়মতো কারও দেখা নেই। মালি মালি!

মালি জড়োসড়ো ভাবে দাঁড়িয়েছিল। উত্তর দেবার সাহস তার হচ্ছিলনা। মিসেস চোপরা তাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন: এই তো লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।

দাঁড়িয়ে আছে! তা হতভাগা তো পুতুল নয় যে কথা কইতে পারেনা!

মনোহরের দিকে ফিরে বললেন: কোথায়, তোমার মালপত্রের রসিদ দেখি।

মনোহর তার জামার পকেট হাতড়ে রসিদ বার করে দিল।

মিস্টার চোপরা বললেন: এই নাও। সোজা স্টেশনে যাবে। মেল এলে মাল খালাস করবে। কুলি নেবে। দরকারের চেয়ে একটি পয়সা বেশি দেবেনা।

মিসেস চোপরা বললেন: এ সবই তো তোমার বলা আছে।

ওর মনে আছে কিনা জিজ্ঞেস কর।

নিঃশব্দে মালি রসিদখানা হাতে নিল, তার চেয়েও নিঃশব্দে গেল গেটের বাইরে। মিস্টার চোপরা থপথপ করে বারান্দার উপরে উঠলেন।

ঘরে ঢুকেই মনোহর বলল: এত অন্ধকার মা? বড় ডিপ্রেসিং নয়!

মিসেস চোপরা তাড়াতাড়ি বাতিটা জ্বেলে দিলেন।

ভিতর থেকে কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিল। মিস্টার চোপরা বললেন: বিলের ক্ষিধে পেয়েছে।

মিসেস চোপরা বললেন: ক্ষিধের আর দোষ কী! বেলা তো কম হয়নি!

বলেই পাশের ঘরে গেলেন খাবার তদ্বির করতে। ফিরে এসে বললেন: সব তৈরি আছে।

মনোহরের দিকে তাকিয়ে বললেন: তুমি কি স্নান করবে?

স্নান: মনোহর আশ্চর্য হল: এখন তো লাঞ্চের সময়।

তাইতো!

মিসেস চোপরা তাদের খাবার-টেবিলে ডেকে আনলেন। টেবিলে খাবার দেওয়া হচ্ছে।

মনোহর টেবিলের উপরটা একবার ভাল করে দেখেই বলল: হাউ অ্যাবাউট অ্যান অ্যাপাটিফ?

অ্যাপাটিফ! মিস্টার চোপরা ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। অ্যাপাটিফ কি অ্যাপিটাইট থেকে এসেছে! অ্যাপিটাইট মানে তো ক্ষিধে। তবে কি ক্ষিধে পায় এমন কোন খাদ্যের কথা সে বলছে! খাদ্য না পানীয়!

মনোহর নিজেই আবার প্রশ্ন করল: কিছুই নেই? লাগার! গিনেস! হুইট ব্রেড!

মিসেস চোপরা তাড়াতাড়ি বললেন : রুটিই করতে বলেছি, ভাত তো আমরা খাইনে।

মনোহর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মিস্টার চোপরা এবারে বুঝতে পারলেন ছেলে কী চাইছে। কিন্তু তিনি ভাবতে পারেননি যে সে এমন বেহায়া হয়ে ফিরবে। একি বেহায়াপনা নয়! বাপমায়ের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসে এমন নির্লজ্জভাবে নিজের পরিচয় দিচ্ছে!

মিসেস চোপরা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

মনোহর বলল : লাগার বুঝি এদেশে চলেনা? জার্মেনির বিয়ার, বিলেতের গিনেস বা হুইট ব্রেডের চেয়েও ভাল।

এবারে মিসেস চোপরাও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। খুব ছোট নিঃশ্বাস খুব সন্তর্পনে ফেললেন। স্বামীর কানে যেন শব্দটা না যায়।

মিস্টার চোপরা খুব আগ্রহ করে একটা মুরগির পা নিয়েছিলেন। আর একটুখানি লাল টকটকে ঘন ঝোল। বাঁ হাতের তন্দুরের একখানা রুটিও সংগ্রহ করেছিলেন। ডান হাতে সেই রুটিখানা ছিঁড়তে গিয়ে কেমন ঝিমিয়ে পড়লেন।

মনোহর তবু উৎসাহ পেয়েছে। একসঙ্গে এত খাবার ও দেশে চোখে পড়েনা। মুর্গিতো একটা ডেলিকেসি!

আর কথা না বলে মুর্গির প্লেটটা সে কাছে টেনে নিল।

আট

দক্ষিণের জানালা দিয়ে রোদ আসছে। খুশির বন্যা। খাটখানা ঠিক নিচে বিছিয়ে সেন ডাকল ঃ মায়া!

পাশের ঘর থেকে মায়ার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। বোধহয় গুণগুণ করে গান গাইছে। কোন উত্তর দিলনা।

কী করছ তুমি?

সেন বোধহয় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

মায়া বলল ঃ আমি পালিয়ে যাইনি।

যাওনি বুঝি!

মায়ার হাসি শোনা গেল মুক্ত ঝরণার মতো। বলছ ঃ তুমি বুঝি সেই ভয় পাচ্ছিলে!

গম্ভীরভাবে সেন বলল ঃ ভয় কি আর অকারণে পাই!

মায়া হাসতে হাসতেই শোবার ঘরে এল। কোমরে তার শাড়ির আঁচল জড়ানো। কপালের উপর থেকে একগোছা চুল সরিয়ে বলল ঃ কারণটা কী শুনি?

মায়ার চোখের উপর চোখ তুলে সেন বলল ঃ তুমি একটু বেশি সুন্দর।

ঐ এক কথা।

মায়া কাছে আসছিল। সেন বলল ঃ চাদরটা জড়িয়ে এস।

আলনা থেকে মায়া চাদরটা নিল। কিন্তু উত্তরও দিল। বলল ঃ ভয় নেই, নিউমোনিয়ায় মরবনা।

সেন বিরক্তি প্রকাশ করল ঃ আঃ! এতক্ষণ কী করছিলে বলত?

বাসনগুলো গরমজলে ভিজিয়ে দিলাম। পরে মাজতে সুবিধে হবে।

সেন আরও গম্ভীর হল। বলল : কিছুতেই আমার কথা শুনবেনা। ওদের ঐ ছোকরাটাকে কাজে লাগালে কী হয়!

শুধু শুধু পয়সা খরচ।

উত্তর শুনে সেন মুখ ফিরিয়ে শুল।

সেন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে দেশে। চাকরি করে ভারত সরকারের। একটা বৃত্তির টাকায় বিলেত গিয়েছিল। চাকরি করে খরচ চালিয়েছে। নতুন কাজকর্ম শিখে এসেছে। এখন দিল্লীতে আছে। কোন ফার্মের চাকরি নিলে কিছু আর্থিক সুবিধা হত। কিন্তু গোলামি বাড়ত। সরকার পয়সা কম দিক, খুব বেশি গোলামি চায়না। অন্তত আত্মসম্মান বাঁচিয়ে কাজ করা যায়। উপরওয়ালার সঙ্গে বনিবনা হলেতো ভালই, না হলেও ক্ষতি নেই। বদলি নেওয়া চলে, বরখাস্ত হবার ভয় নিতান্তই কম। কন্‌স্টিটিউসনের তিনশো এগার নম্বর ধারা সারাক্ষণ তর্জনী উঁচিয়ে আছে।

অন্যদিকটা রোজ অনুভব করতে হয়। নুন আনতে পান্‌তা ফুরোয়, পান্‌তা আনতে নুন। সেন বিয়ে করেছে সম্প্রতি, ছেলে মেয়ে এখনও হয়নি। এক বিষয়ে সে সৌভাগ্যবান। বাঙলা দেশের আর দশটা ছেলের মতো তাকে বড় পরিবারের ভার বইতে হয়না, কেউ তার মুখাপেক্ষী নয়। সেনের বাবা কলেজের অধ্যাপক আর মায়া জমিদারের মেয়ে। রাজা খেতাবের জমিদার নয়, কিছু জমি আছে বলেই জমিদার। অর্থাৎ খেটে খেতে হয়না, বিলাস ব্যসনের জন্য সচ্ছলতাও আছে। সেই ঘরের মেয়ে মায়া শখ করতে জানে, মেটাতেও জানে। মাথা পিছু দশটাকা খরচ করলে দেশী হোটেল থাকতে দেয়, খেতেও দেয়। কিন্তু মায়া তাতে রাজী নয়। এক মাসের মাইনে পনর দিনে খরচ করে লাভ কী! যাতায়াতটা তো মুফতে

হবেনা! মায়ারা তাই স্থইট ভাড়া নিয়েছে। দুখানা ঘর, বাথরুম। একখানা শোবার আর একখানা বসবার। তাতেই খাবার টেবিল। গোটা দুই টাকা বেশি দিলে একটা রান্নাঘরও পাওয়া যায়। দুজনের রান্না এমন কী পরিশ্রমের কাজ! ইলেকট্রিক স্টোভ আছে, আর আছে ইক্‌মিক কুকার। রান্না চড়িয়ে দিয়ে বেড়াতে যাও। রাতে ভাত ভাল না লাগে হোটেল থেকে রুটি নিয়ে খাও। সিমলার পুরিও ভাল। নাথুরামের রাবড়ি পুরি। কিংবা পাঁউরুটির সঙ্গে মুরগির রোষ্ট। বেড়িয়ে ফিরবার সময় শুধু বাজার হয়ে ফেরা। নিজে দেখে জিনিস কেনারও যে আনন্দ আছে। দিল্লী কলকাতায় এ স্থখ নেই।

মায়া বাসনও নিজে হাতে ধোয়। বলে, দুখানা বাসনের জন্য আবার লোকের কী দরকার! সেন বলে, এই ঠাণ্ডায় কেন ধোবে! সেনের আরও একটা আপত্তির কারণ আছে। মায়ার হাত দুখানা অদ্ভুত নরম। ও হাত বাসন মেজে শক্ত হবে, এতে তার ভারি আপত্তি। তাইতেই সে মুখ ফিরিয়ে শুল।

মায়া এই আপত্তির কারণ বোঝে। পাশে বসে তার চুলের ভিতর হাত চালিয়ে দেয়। বলে: হাতটা ক্ষয়ে গেছে?

সেন উত্তর দিলনা।

কথা কইছ না যে?

কী বলব!

মায়া তার হাতখানা কপালের উপর থেকে গালের উপর নামিয়ে আনল।

সেন অভিমানের স্থরে বলল: ঘষলে পাথরও ক্ষয়।

আমার হাতখানা কি পাথরের মতো মনে হচ্ছে?

ফুলের মতো, পালকের মতো।

আর কিসের মতো?

মনের।

বলেই নিজের একখানা হাত দিয়ে মায়াকে আকর্ষণ করল।

মায়া শক্ত হয়ে ছিলনা। সেনের গায়ের উপরেই হেলে পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে বলল ঃ ঐ বুড়ো ভদ্রলোক!

কোথায়?

বারান্দার রোদে চেয়ায় টেনে বসেছে।

তাতে আমাদের কী?

এইবারে পায়চারি শুরু করবে।

আমরা তাকে না দেখলেই হল।

সে আমাদের দেখতে চাইবে যে!

দেখুক।

বলে সেন আবার মায়াকে টানল। মায়ার ভাল লাগে।

ঘুমিয়ে তারা সিমলার দুপুর কাটাতে চায়না। জেগে থাকার আনন্দ যে অন্য রকম। মায়া হঠাৎ সচেতন হয়ে সোজা হয়ে বসল। বলল ঃ তোমার সেই বন্ধুর কথা বল।

বড় অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। সেন কিছু না ভেবেই বলল ঃ কোন্ বন্ধু?

আজ দুপুরে যার সঙ্গে দেখা হল, সজ্ঞৌলি থেকে ফেরার পথে!

প্রিন্স চোপরা!

সেন হাসল।

সত্যি সত্যিই প্রিন্স নাকি?

সেন হাসল আরও জোরে জোরে।

তুমি শুধু শুধু হাস।

ট্যাক্স বসবার আগে ভাল করে হেসে নিচ্ছি।

হাসির ওপরেও ট্যাক্স বসবে নাকি?

বিনে ট্যাক্সে সরকার কিছু ভোগ করতে দেবেনা। হাসিও তো ভোগ। তোমার হাসিতে আমার পেট ভরে।

আমার উল্টো। তোমার হাসিতে আমার ক্ষিদে পায়।

সেন বলল: বেশ বলেছ তো, কার হাসিটা বেশি ভাল পরখ করা যাক।

তার চেয়ে তোমার বন্ধুর কথা বল। বিকেলে আসবেন বলেছেন, তার আগেই সব শুনে রাখি।

শোনাবার মতো হলে কি এতদিন তোমায় শোনাতাম না? বড়লোকের আদুরে ছেলে বাপের অর্থ ধ্বংস করতে গিয়েছিল। সুষ্ঠু ভাবে সে কর্তব্য পালন করেছে।

মায়া আরও কিছু শোনবার অপেক্ষা করছিল। সেনকে থামতে দেখে বলল: আর একটু খুলে বল।

নোংরা ঘাঁটব?

নোংরামিকে তুমি ভয় পাও?

পাঁকাল মাছ হলে পেতামনা।

মায়া অভিমানের সুরে বলল: আমার অনুরোধ তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।

সেন আর দেরি করলনা। মায়ার কোমর বেষ্টন করে তার কোলের উপর রাখল নিজের হাতখানা। তারপর বলল: সব খবর আমি রাখিনে, আমার সময় ছিল কম। তবে অনেক কিছু কানে আসত।

তাই বল।

সেন বলল: হোটেলে থাকার স্বপ্ন আমরা দেখিনি। চোপরা হোটেলে থাকত। পয়সার অভাব হলে নাকি পালিয়েও যেত। তখন কী করত, কোথায় থাকত, সে সব কথা কেউ জানতে পারত না। আমরা আর দশটা বিদেশী ছেলের মতো সহরের বাইরে

থাকতাম কোন বুড়ো বুড়ির সংসারে পেয়িং গেষ্ট হয়ে। ব্রেকফাষ্ট খেয়ে দৌড়তাম কাজে, চায়ের সঙ্গে কয়েকখানা স্যাণ্ডুইচ কামড়ে লাঞ্চ হত, বাড়ি ফিরে ডিনার। সপ্তাহের গোড়ার দিকে এক আধ দিন খরচ করে লাঞ্চও খেতাম। সপ্তাহ শেষে ক্লাব। তার আগে এ পাঁইট অফ বিয়ার ফ্রম দি ড্রট। শৌখিনরা বসত কগ্‌ন্যাক বা সিন জানো নিয়ে। আর একটা দল ছিল যাদের বাড়ি থেকে টাকা আসত। রোজগারের ধান্দা নেই বলে তারা দুপুরবেলায় পড়ে পড়ে ঘুমত, কিংবা যেত কিউ গার্ডেনে। কলেজের খাতায় নাম থাকত।

নাম থাকত ক্লাবের খাতাতেও। ফ্রিথ স্ট্রীটের কোৎ দ্য আজুয়ে। কিংবা ঐ রাস্তারই বেল আমিতে। বন্ধুদের কাছে নাচ শিখে সেখানে নাচত মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে। তাদের ড্রিঙ্ক্‌স অফার করত, ট্যাক্সি চড়াত, আর বেপরোয়া ফুর্তি। চোপরা ছিল রাজা রাজড়ার দলে। উইণ্ড মিল থিয়েটারে ওর বাঁধা আসন ছিল। মডেলদের ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স ওর মুখস্ত। তাদের দুএকজনকে নিয়েও ঘুরেছে। স্যাব্রিনাকেও ছুঁয়েছে বলত। আমাদের সাধ্য কি, চোপরার কাছে ঘেঁষি।

মডেলদের গল্প মায়া সেনের কাছে শুনেছে। ষ্ট্রিপ টিজ অ্যাক্টে তারা কেমন করে নিরাবরণ হয়, কেমন করে আইন বাঁচায়, তাও সে শুনেছে। বলল: দেশে এসে এখন কী করবে?

সেই জানে।

আজ বিকেলে তো তোমার কাছেই আসছে।

কেন আসছে জানি।

কেন?

একটা পিপে তো। বোধহয় খোঁজ খবরের দরকার।

তার জন্যে তোমার কাছে?

বাপকে বোধহয় জিজ্ঞেস করবেনা।

বোধহয় বলছ কেন?

যে ভদ্রলোক এত টাকা জোগান, তাকে একটু সম্মান করবে না!

বিলেতেও কি এ অসম্মানের কাজ?

তা বটে। তার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়।

মায়া খানিকক্ষণ কথা কইলনা। তারপর বলল: একটু চা খাবে?

তোমার নেশা হয়েছে বুঝি?

পাগল!

তবে আমার জন্যে এত দরদ! হায় ভগবান!

মায়া উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল: সে ভদ্রলোক আবার কী অপরাধ করলেন?

এ কথার উত্তর সেন দিলনা। বলল: আমাকেও উঠতে হল দেখছি।

বেশ তো লেপের ভেতর শুয়ে আছ, তুমি কেন উঠতে যাবে!

না উঠে আর উপায় কী! বাসন কখানা তো মেজে ফেলতে হবে।

কোমরে কাপড় জড়িয়ে মায়া বলল: খুব হয়েছে।

জানো: সেন জবাব দিল: বিলেতে আমি যাদের গেষ্ট ছিলাম, তাদের বুড়ি রাঁধত সারা হপ্তা। কিন্তু রবিবার কিছুতেই বিছানা ছেড়ে উঠতনা। সেদিন বুড়ো মর্নিং টি দেবে। ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ, আফ্‌টারনুন টি থেকে ডিনার পর্যন্ত বুড়োর দায়িত্ব। আমার ভারি ভাল লাগত।

সিমলায় এসে তাই বুঝি কাজ দেখাচ্ছ!

লেপের তলায় শুয়ে শুয়েই সেন বলল: চায়ের সময় কি হয়েছে?

মায়া বলল: তোমার প্রিন্স বন্ধু এসে পড়বার আগেই হাতের কাজটুকু সেরে রাখি।

এইজন্যে তাড়া!

সেন নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু বেশিক্ষণ শুতে পারলনা। বাইরে দরজায় কে টোকা দিল। দরজা খুলতে মায়া ছুটে গেলনা। চাপা গলায় সেনকে বলল: বোধহয় সেই ভদ্রলোক। মাঝখানের দরজা আমি বন্ধ করে দিচ্ছি।

দরজা কেন বন্ধ করবে?

একেবারে পরিষ্কার হয়ে বেরব।

লেপের তলা থেকে সেন বেরিয়ে এল। বলল: অন্য লোক হলে?

মায়া বলল: জানিয়ে দিও।

মায়া শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করল। এই ঘরে ইলেকট্রিকের প্লাগ আছে, চায়ের ব্যবস্থাও আছে। সেন বসবার ঘরে গিয়ে বাইরের দরজা খুলে দিল। চোপরাই বটে। বলল: দেখলেতো, খুঁজে খুঁজে ঠিক বার করেছি। কিন্তু আমি কি ডিস্টার্ব করলাম?

সেনের বলতে ইচ্ছে হল, তা একটু করলে বৈকি। কিন্তু সত্য কথা সব সময় বলা যায়না। সত্যের চেয়ে সমাজে সৌজন্য বড়। তাই হেসে বলল: আমরা তোমারই অপেক্ষা করছিলাম।

রিয়ালি!

কাঁধটা উচু করে মনোহর অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করল।

উত্তরে যেন হাসল।

ঘরের চারদিকে চেয়ে চোপরা বলল: মিসেস সেন কোথায়?

যেন ইশারায় তাকে দরজা দেখাল। বলল: ওদেশ থেকে কাউকে সঙ্গে আনলেনা?

ছোঃ।

কেউ এলনা বুঝি?

আনবার মতো কি?

সেন অন্য কথা বলল : সন্ধ্যেবেলায় কী করছ ?

তাইতো জানতে এলাম।

এখানে তোমার চলবে না।

ইজ ইট সো ফ্রাইটফুলি ডাল ?

নিজেই সব দেখতে পাবে।

মনোহরের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

আরও খানিক্ষণ পরে মায়া মাঝখানের দরজাটা খুলে দিল। সেন এগিয়ে গিয়ে বলল: চা হয়েছে বুঝি? দাও, আমার হাতে দাও।

বলে দু পেয়ালা চা নিল মায়ার হাত থেকে। এক পেয়ালা এগিয়ে দিল চোপরার সামনে।

বসবার ঘরে মোটা কার্পেট বিছানো। পুরনো কার্পেট। সোফাসেটও পুরানো। তার উপর রঙীন কভার জড়ানো। এক কালে এ সব সাহেবদের হোটেল ছিল। আজকাল এসেছে ভারতীয়দের হাতে। পুরনো আসবাব পত্রই চলছে। মায়া এসে সেনের পাশে সোফায় বসল। তার হাতেও চায়ের পেয়ালা।

মনোহর চা পান করতে ভাল বাসেনা। এ সব নাকি পানীয়ই নয়। বিলেতে সে এই কথাই বলত। সেন ভাবছিল। এখানেও, এই কথাই বলতে পারে। তারই অপেক্ষা করছিল। মনোহর মায়ার মুখের দিকে তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে বলল: তোমার বুঝি আর কিছু চলেনা ?

সেন হেসে ফেলল। বলল: চলে বৈকি। কফি কোকো ওভালটিন—

ডোণ্ট বি সিলি।

মনোহর চায়ের পেয়ালাতেই চুমুক দিল।

মনোহর স্থির হয়ে বেশিক্ষণ বসতে পারলনা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল: কাল সন্ধ্যেবেলায় তোমরা ফ্রি আছ ?

কেন বলতো ?

বুড়োবুড়ি একটা পার্টি দিচ্ছে। তাঁর নিজের বন্ধুবান্ধব। একটু গান বাজনা। তোমরা আসবে তো ?

সেন বলল : আমাদের আবার কেন টানছ ?

আমার বড় লোন্‌লি বোধ হবে।

সেন মায়ার দিকে তাকাল। তার নিঃশব্দ দৃষ্টিতে কী জবাব পেল সেই জানে, বলল : বেশ।

এই সম্মতিতে মনোহর খুশী হল কিনা বোঝা গেলনা। ক্লান্তভাবে অনুরোধ করল : এস কিন্তু।

যাবার আগে মায়াকেও তার অনুরোধ আবার জানিয়ে গেল।

নয়

স্মিতাকে শেষ পর্যন্ত সনাতনের শরণ নিতে হল। মিস্টার চোপরার পার্টিতে বিধায়কের নিমন্ত্রণ নেই। হরিহরবাবুরও ধারণা যে তাঁকে বলা হয়নি। বলা হলেও তিনি যেতেননা। দুজনেই যখন একই অফিসে কাজ করতেন, তখন নিতান্ত দায়ে না পড়লে ঐ সাহেবটির ঘরে তিনি যেতেননা। অত বড় চাকুরের অমন ছোট নজর! পয়সার জন্য করতে পারতেননা এমন কাজ নেই। তাঁর হ্যাংলামির কথা হরিহরবাবু ভুলতে পারবেননা। সেই সাহেবের বাড়ি আজ নিমন্ত্রণ! এক চুমুক জল তাঁর গলা দিয়ে নামবেনা। বিষের মতো জ্বালা করবে, কল্‌জে জ্বলে যাবে। কান্নার মতো করুণ কণ্ঠে তিনি মেয়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন: আমাকে তুমি সঙ্গে টেনোনা।

বাপের কাছে হেরে গিয়ে মাকে ধরেছিল।

তুই পাগল হলি: মা বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন: আমি তোর বাপের সঙ্গে বেরতে পারিনে, আমি যাব যেখানে সেখানে!

একি যেখানে সেখানে হল?

হলনা! চেনা নেই, শুনো নেই, একখানা ছাপা চিঠিরও নেমন্তন্ন নেই। একি কালী বাড়ি যাওয়া, যে মন চাইলেই চল।

তোমার মন তাহলে চাইছে বল?

আস্তে আস্তে মা বললেন: তোমার বাবা আমাকে মেরে ফেলবেন।

তাহলে উপায়! স্মিতা ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, বলল: ঠিক হয়েছে। পল্টু আমার সঙ্গে যাবে।

স্মিতা ডাকল ঃ পল্টু, ও পল্টু!

পাশের ঘরে পল্টু মেকানো নিয়ে বসেছে। উত্তর দিল ঃ একখানা ক্রেন তৈরি করছি।

লক্ষ্মী ভাইটি আমার ঃ স্মিতা তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ঃ আমাকে নিয়ে একটু বেরবি ?

ভাইএর বয়স বছর বারো। তবু তো পুরুষ মানুষ। সঙ্গে থাকলে সাহস থাকে।

পল্টু বোধহয় গৌরব বোধ করল, বলল ঃ কেউ নেই বুঝি আজ ?

তুই ভারি ভালো ছেলে।

পল্টু আশ্চর্য হল। মুখ তুলে তাকাল দিদির দিকে।

স্মিতা বলল ঃ এক জায়গায় নেমন্তন্ন আছে, কেউ নিয়ে যাচ্ছেনা।

আমার তো দেরি হবে।

কেন ?

নতুন ধরনের ক্রেন গড়ছি। ঠিক মতো তৈরি হলে, বুঝলে দিদি—

কী হবে ?

কার্ট রোডের মোটর গাড়িকে মল রোডে টেনে তোলা যাবে।

ওরে বাবা, এমন সাংঘাতিক ক্রেনের কথাতো কেউ ভাবতেই পারবেনা।

পল্টু একবার দিদির মুখের দিকে তাকাল। ঠাট্টা করছে নাতো! দিদির মতো গম্ভীর ভাবে কেউ ঠাট্টা করতে পারেনা। পল্টুর সন্দেহ দেখেই স্মিতা হাসল।

সনাতন কখন এসেছে টের পাওয়া যায়নি। তার কথা শোনা গেল পাশের ঘর থেকে ঃ মানুষগুলোকেও তুলতে পারবে তো ?

এইতো সনাতনদা এসে গেছেন।

তারপর জোরে জোরে জিজ্ঞাসা করল ঃ মানুষ ?

হ্যাঁ, মানুষ।

একটু মুস্কিল আছে সনাতনদা। আমার ক্রেনে হুক আছে, মানুষের কোথায় গাঁথব।

কেন, গলায়!

গলায় গাঁথলে তো মানুষ মরে যাবে!

তা যাবে। কিন্তু মরা মানুষতো ওপরে উঠবে। তাইবা কম কী! ঐ কার্ট রোডের লোকেরাই আজকাল দেশের গাড়ি টানছে। কিন্তু মরলে তাদের গড়িয়ে ফেলে দেওয়া হয়। চিতা জ্বালাবার কাঠ নেই।

স্মিতা এ সব কথা ভালবাসেনা। বলল: আপনি কি নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাচ্ছেন?

নিমন্ত্রণ তো আমি পাইনি।

পাননি! আমি শুনলাম—

ঠিকই শুনেছেন। আমার ওপর তবলা বাজাবার ভার পড়েছে। আর আপনি গাইবেন। আমি না গেলে তবলা বাজবেনা। আধুনিক গানের জন্য তবলার প্রয়োজন নেই, বুট ঠুকে পায়ে তাল দিলেও চলে।

আপনি কি যাবেননা ভাবছেন?

তাতে আপনারই অসুবিধা হবে।

কেন?

নতুন জায়গায় আমি বেপরোয়া তবলা বাজাই। কিন্তু পরিচিত লোক থাকলে একটু সমঝে চলতে হয়।

বুঝেছি। আমি একাই যাব।

সাধু। কিন্তু ফিরবেন কার সঙ্গে?

আমি কি একা ফিরতে পারবনা?

পারবেন, কিন্তু উচিত হবেনা।

স্মিতা বলল: পৌঁছে দেবার অনেক লোক পাব!

তারা পৌঁছতে পারবেননা, তাঁদেরই পৌঁছতে হবে। কাল সন্ধ্যায় নমুনা দেখেছি।

স্মিতার বোধহয় সেই নমুনার কথা জানবার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারলনা। যে লোকটাকে ভাল লাগেনা, তার কাছে কৌতূহল প্রকাশ করতে লজ্জা করে। কিন্তু সনাতন তার মনের ভাব বুঝতে পারল, সংক্ষেপে বলল : জুনিয়ার চোপরাকে কাল দেখেছি।

স্মিতা মুখে প্রশ্ন করলনা, কিন্তু দৃষ্টিতে তার কৌতূহল গোপন রইলনা।

সনাতন বলল : একা ফিরেছে।

স্মিতা ভাবল, সনাতন কি আর কিছু বলবেনা!

সনাতন বলল : বাকিটুকু নিজের চোখে দেখুন। এক সন্ধ্যাতেই ষোল আনা অভিজ্ঞতা হবে।

স্মিতা এই রকম মন্তব্যের কারণ বোঝে। যে সমাজ নাগালের বাইরে তার প্রতি সবারই একটা স্বাভাবিক লোভ আছে। সেই লোভ ঘন হয়ে মন তিক্ত করে। শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের গল্প চিরকাল সত্য হয়ে থাকবে।

সনাতন বলল : একটা কথা আপনাকে বলে রাখি। ওদের মজলিশে আমি যোগ দিতে পারি। কিন্তু দেবনা। অন্যের সঙ্গে আমার এই খানেই প্রভেদ।

কেন দেবেননা ?

কথাটা অপ্রিয়।

তা হোক।

এক রাজবাড়ির গল্প বলি।

আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

গল্পেই আপনার উত্তর পাবেন। রাজা অল্প বয়সের, রাণী নেই।

আর এক দেশের রাজা রাণী এলেন। বন্ধু তাঁরা। বললেন, তোমাদের দেশের সেরা গান শুনব। দেশের সেরা গান গায় একেবারে পাড়াগেঁয়ে লোক। দরবার ঘরে তাদের আনা যায় না। বিদেশী রাজা কী ভাববে? সম্মানে তাঁর চেয়েও যে বড়! শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, উঠোনে তারা গাইবে। আর এঁরা দেখবেন বারান্দায় বসে। ভাল কথা। ভাল গান হল। রাজা রাণী মোহিত হলেন। দেশের রাজা বললেন, কেমন শুনলেন? বিদেশের রাজা বললেন, চমৎকার। কিন্তু রাণী কী বললেন জানেন?

কী?

রাণী বললেন, কিন্তু উঠোনে কেন গান হল? উঠোনে কেন? দেশের রাজা মাথা চুলকে বললেন, ওদের যে জাত নেই। রাণী বললেন, আমরা তো জাত মানিনে। ওদের গান আমি অন্দরে শুনব।

সনাতন একটা নিঃশ্বাস চেপে বলল: বিদেশের রাজা রাণী থাকলে যেতে আমার আপত্তি হতনা।

স্মিতা কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার অবসর পেলনা। হরিহরবাবু সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন: তুমি নিতান্তই যাবে?

তুমি আপত্তি ক'রোনা বাবা।

স্মিতার অনুরোধ বড় করুণ শোনাল।

হরিহরবাবু বাধা দিতে পারলেননা। বললেন: সোনাতন তোমার সঙ্গে যাবে। তৈরি হয়ে নাও।

স্মিতা সনাতনের মুখের দিকে একবার তাকাল। আপত্তি করলনা দেখে তখুনি বেরিয়ে গেল।

হরিহরবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: বস।

বসবার আগে সনাতন একটু হাসল। করুণার হাসি। হরিহর

বাবু দেখলেন, কিন্তু রাগ করতে পারলেননা। রাগ করবার মুখ কোথায়! হাতে চুনকালি নিয়ে মেয়ে যে তাঁকে ভয় দেখাচ্ছে।

একখানা চেয়ারে বসে সনাতন বলল: কিছু বলবেন আমাকে?

হরিহরবাবু নিজেও বসলেন, বললেন: তোমাকে আর কী বলব!

কেন, সঙ্কোচ হচ্ছে?

তোমার কাছে সঙ্কোচের কিছু নেই। তুমিতো সবই জান, বোঝ আরও বেশি।

ওটাতো আমার গুণের কথা বলে মনে করেননা বাঁড়ুজ্জে মশাই, ওটা আমার ডেঁপোমি বলে দূরে ঠেলে রাখেন।

হরিহরবাবু একথার উত্তর দিলেন না। তিনি মিথ্যে বলেননা, সত্য কথা গোপনের চেষ্টাও করেননা। সনাতন তাঁকে লক্ষ্য করে বলল: এ শুধু আপনার নয়, মানুষ মাত্রেরই এই দুর্বলতা। মানুষ যদি দেবতা হত, তাহলে তার কাজের সমালোচনার প্রয়োজন হতনা। সত্য বললে তা প্রিয় হত। মানুষ দেবতা নয় বলেই সত্য অপ্রিয় হয়েছে। তার দুর্বলতা কত, কত অধঃপতন। এ সব কথা চোখের সামনে তুলে ধরলে কার ভাল লাগে বলুন?

হরিহরবাবু অন্য কথা ভাবছিলেন। বললেন: মেয়েটাকে একটু নজরে রেখ।

সে সুযোগ দিলে তা রাখব বৈকি!

কেন সুযোগ দেবেনা?

আপনাকেও কি সেকথা বলতে হবে!

হরিহরবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন: ওদের বাড়ি তুমি চেন তো!

তা চিনি। বিলো রিজ।

বিলো রিজ!

হ্যাঁ, রিজের নিচে। মলরোড নয়, কাজেই বুঝতে পাচ্ছেন।

ও ধারে তো কিছুই নেই!

কেন, পূর্ব দিকটায়?

সেদিকে তো লক্কড় বাজার।

ছিছি, ও নাম মুখে আনবেননা। ও পাড়ায় কি সাহেবরা থাকে, না থাকতে পারে! এই তো, আমার এক বন্ধুর কথা আপনাকে বলি। তাদের কাস্‌ল্ ছিল নফর চন্দ্র কুণ্ডু লেনে। রাজ প্রাসাদের মতো বিশাল বাড়ি। কিন্তু বাড়ির ছেলেরা কিছুতেই ঠিকানা বলতনা। আর এক বন্ধু ছিল ক্যামাক ষ্ট্রীটের একটা ভাঙ্গা বাড়িতে। সে সারাক্ষণ তার ঠিকানা বলত। জুনিয়ার চোপরা শুনেছি লক্কড় বাজার কেটে বিলো রিজ করেছেন।

হরিহরবাবু হেসে উঠলেন না। কিন্তু চমকে উঠলেন স্মিতার হাসি শুনে। সে তৈরি হয়ে বেরিয়েছে। ভিতর থেকে মা তাকে বিদায় দিলেন, বাইরে বাবা। স্মিতা পথে নামল সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে।

সনাতনের বিশ্বাস হয়নি যে স্মিতা তার কথা শুনে হেসেছে। কেননা, এ কথা শুনে আর যেই হাসুক স্মিতা এখনও কিছুদিন হাসবেনা। তাই খানিকটা পথ এগিয়েই জিজ্ঞাসা করল: আপনাকে একটা প্রশ্ন করব?

করুন না।

বেরবার আগে আপনি হেসে উঠেছিলেন। সে নিশ্চয়ই আমার কথা শুনে নয়!

স্মিতা আবার হেসে উঠল।

সনাতন ঘাবড়াবার ছেলে নয়। বলল: বুঝেছি।

কিছুই বোঝেননি।

বললেন যে চোরের মন বোঁচকার দিকে।

স্মিতা খুবই চিন্তিত হল। বলল: ঠিক এই কথাটিই আমার মনে হয়েছিল। কী করে বুঝলেন বলুনতো?

অপরকে বোকা ভাবতে নেই। আমরা তাই ভাবি বলে নিজেরাই বোকা হয়ে থাকি।

স্মিতা বলল: আপনাকে বোধহয় আরও একদিন বলেছি যে, জ্ঞানের কথা আমার ভালো লাগেনা। স্কুল কলেজের পড়া আমার শেষ হয়ে গেছে।

এটা খুব বুদ্ধির কথা। জ্ঞানেরও তো ভার আছে। কলেজ থেকে বেরবার সময় দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে বেরলে সারা জীবন আর ভার বইতে হবেনা। শুনতে পাচ্ছি, আজকালকার ছেলেমেয়েরা নাকি আরও বুদ্ধি ধরে। তারা জ্ঞানের দরজটা ভাল করে এঁটে দিয়ে স্কুলে ঢোকে। কথাটা যে মিথ্যে নয়, তার নমুনা দেখতেই পাচ্ছেন। আর প্রমাণ পেতে হলে বাঙলা খবরের কাগজ পড়ুন, বিশেষ করে স্কুল—কলেজের পরীক্ষার সময়।

বাধা দিয়ে স্মিতা বলল: আপনি কোন গল্প বলতে পারেননা?

পারি।

চুপ করে চলতে না পারেন, একটা গল্পই বলুন।

চুপ করেও চলতে পারি।

বলে সনাতন নিঃশব্দে পথ চলতে লাগল। সনাতন জানে যে স্মিতা এখন গভীর ভাবে কিছু ভাবছে। সেই ভাবনাও অনুমান করার চেষ্টা করতে লাগল। তার মন নিশ্চয়ই বিলো রিজে পৌঁছে গেছে। জাঁক জমক নিমন্ত্রিত অভ্যাগত তাদের সাজসজ্জা আচার আচরণ কথাবার্তা। সনাতন দেখল চলতে চলতেই স্মিতা নিজের দেহটাকে একবার দেখে নিল। বোধহয় ভাবছে, এই সাজে ঐ সমাজে তাকে মানাবে কিনা। তারপর! বোধহয় তার ভয়ও হচ্ছে অল্প অল্প। যে সমাজের সঙ্গে তার পরিচয় নেই দিনের বেলায়, সেই সমাজে সে রাত্রে যাচ্ছে সামাজিক উৎসবে। মানিয়ে নিতে না পারলে যে লজ্জার কথা হবে।

হঠাৎ স্মিতা প্রশ্ন করল : এই রকম পার্টিতে আপনি অনেকবার গেছেন, তাই না ?

সনাতন তার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু হাসল।

হাসলেন যে ?

স্মিতা বোধহয় খানিকটা লজ্জা পেয়েছে। লোকটা কি তার উদ্বেগের কথা ধরে ফেলেছে !

হাসলুম আপনার দুর্ভাবনা দেখে।

তাতো বুঝতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন হাসবেন ?

আপনিই বা কেন ভাববেন ?

ভাববনা ?

নিশ্চয়ই না। আপনি আমার মতো নিমন্ত্রিত। সামাজিক দূরত্বের জন্যে আপনার বাবা মার নিমন্ত্রণ হয়নি। হয়েছে আপনার আর আমার। সামাজিক কারণে যে হয়নি, তা সহজেই বুঝতে পারছেন। যে কারণে হয়েছে, তাও আপনার অজ্ঞাত নয়। তবে আর ভাবনা কী ? গানের ফরমায়েশ হলেই বসে যাব। তারপর, আপনার যদি আপত্তি না থাকে বাড়ি ফিরে আসব। ওঁরা তাতে খুশীই হবেন।

এ কথা মেনে নিতে স্মিতার কষ্ট হল। কোন উত্তর দিলনা।

সনাতন বলল : আজকের এই আয়োজন কেন বলতে পারেন ?

বিলেত থেকে ওঁদের ছেলে ফিরেছে বলে।

সনাতন হাসল।

তাড়াতাড়ি স্মিতা বলল : কেন, ঠিক বলিনি ?

সনাতন ঘাড় নাড়ল। বলল : ওঁরা পয়সার অপব্যয় করেন না।

মানে ?

ছেলে বিলেত থেকে কিছু শিখে কিংবা কিছুই না-শিখে ফিরেছে। তার একটা গতি করতে হবে তো ? সিমলায় এখন একজন

মন্ত্রী আছেন। তাঁকে দেখতে পেলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

স্মিতার মুখ আরও গম্ভীর হল। লোকটা এত খবরও রাখে!

আরও খানিকটা এগিয়ে সনাতন বলল: নিরিবিলি পথ তো শেষ হয়ে এল। কাজের কথা একটা এইখানেই বলে রাখি।

স্মিতা কোন প্রশ্ন না করলেও বোঝা গেল যে শোনবার জন্য সে কৌতূহলী হয়েছে।

সনাতন বলল: আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পর আর আমরা একটি মুহূর্তও সেখানে থাকবনা।

একটু থেমে বলল: আপনি থাকলেও আমি থাকতে পারবনা। কিন্তু আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব যখন আমার, তখন আমি বাইরে আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

স্মিতা এ কথারও উত্তর দিলনা। এ সবের কি প্রয়োজন হবে! স্মিতার বিশ্বাস হলনা। লোকটা সিনিক বলে বোধহয় এত সব অদ্ভুত কথা ভাবছে। সেই সঙ্গেই লক্ষ্য করল নিচের রাস্তার উপর দুটি মানুষকে। স্বামী স্ত্রী বলেই মনে হচ্ছে। মেরিনা হোটেলের নিচের গেট দিয়ে বেরিয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। স্মিতা একটু আস্তে আস্তে চলতে লাগল। ওদের পিছনে যাবে সামনে নয়। একটুখানি আগে গিয়ে দুটো রাস্তাই মিলেছে। তারপর সোজা গেছে রিজে। রাস্তার নাম মল রোড।

সনাতন তার ফন্দিটা বুঝেছে। বলল: ভারি সুন্দর দম্পতিটি।

দম্পতি কী করে বুঝলেন?

দোষ হয়েছে। কোন স্ত্রী পুরুষকে একত্র দেখলেই দম্পতি ভাবা অন্যায়। কিন্তু মনে হয়েছে বলেই বলে ফেলেছি। আপনারও কি তাই মনে হচ্ছে না?

স্মিতা এ কথা অস্বীকার করলনা।

সনাতন বলল ঃ মেয়েটি যেন চেনা চেনা।

বলেন কি ?

ভুলও হতে পারে। ভুল হলেই মঙ্গল।

ততক্ষণে তারা সামনে পিছনে হয়ে গেছে। সামনে সেই দম্পতিটি, আর সনাতনরা পিছনে। সামনে ওরা কথা কইছে। বাঙলায় কথা। বাঙলা শুনে স্মিতা আরও মনোযোগ দিল।

মায়া বলল ঃ বাড়ি খুঁজে পাবে তো ?

সেন বলল ঃ বিলো রিজ বলেছে, কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে।

সেদিন কিন্তু ওরা গেছে লক্কড় বাজারের দিকে।

সেন বলল ঃ ঐ দিকেই হবে।

বাড়ির নামটা মনে আছে ?

মনে রেখে তো লাভ নেই। নামটা তার নিজের দেওয়া। পুরনো নাম মুছে ফেলেছে।

সনাতন তার গতি আরও একটু কমিয়ে দিল। অস্পষ্ট ভাবে বলল ঃ বুঝতে পারছেন ?

মনে হচ্ছে, একই জায়গায় যাচ্ছি।

তাতে আর সন্দেহ নেই।

কেন ?

লক্কড় বাজারে ঐ বাড়ির নাম ছিল লক্কড় গুদাম। এক লকড়িওয়ালার বাড়ি। রঙ চঙ করে বাড়ির চেহারা বুড়ো বদলে ফেলেছেন কিন্তু নামটা বদলাতে ভুলে গিয়েছিলেন। এখন দেখছি, ছেলে এসেই সে কাজটি সমাধা করেছে।

স্মিতা বলল ঃ সত্যিই বাড়ির নাম ওটা মানায়না।

সনাতন হাসল। তারপর বলল ঃ ওদের সঙ্গে আলাপ করবেন ?

কী ভাববেন ওঁরা !

কিছু ভাববেননা।

মেরিনা হোটেল থেকে যারা বেরয়, তারা আমাদের নাগালের বাইরে নয়। ক্লার্কস্ থেকে বেরলে একটু ভাবনার কথা ছিল।

বাধা দিয়ে স্মিতা বলল : না থাক, পথে আর আলাপ করবনা।

সাতটায় নিমন্ত্রণ। চারদিকে অন্ধকার বেশ ঘনিয়েছে। কিন্তু এই রাস্তার উপর সন্ধ্যেবেলায় অন্ধকার ঘনাতে পারেনা। রাস্তার ধারের দোকানগুলোই চারদিক আলো করে রেখেছে। রিজের উপর দিয়ে যাবার সময় সনাতন একবার উপরের দিকে তাকাল। পাহাড়ের উপর সেই ছোট বাগানটির দিকে। আশা করেছিল, একটি নিঃসঙ্গ মানুষকে দেখবে। দেখলও। যে লোকটা এতক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়েছিল, সে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিল। সনাতন হাসল। পৃথিবীর একজন মানুষ আর একজনকে দেখে হাসে।

দশ

লক্কড় বাজারেই মনোহর অপেক্ষা করছিল। সেন দম্পতিকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: হাউ ওয়ানডারফুল! সো ইউ হ্যাভ কাম।

নমস্কারের ভঙ্গিতে বাঁ হাতটা নাকের কাছে তুলে ডান হাতে সেনের হাত চেপে ধরল। মায়া নমস্কার করল দু হাত জুড়ে।

তারপরেই তারা নিচের রাস্তা ধরল।

স্মিতা তাকাল সনাতনের দিকে। সনাতন বলল: শ্রীমান চোপরা।

পরিচয় নেই?

মূল্যবান প্রশ্ন বটে। পরিচয় থাকলেও হয়তো এমনি ভাবে চলে যেতে পারত।

একটু বাড়িয়ে বলছেন।

এঁর কথা জানিনে, এঁর বাবার কথা জানা আছে। এমন অনেকবার হয়েছে যখন আমাদের অনেককেই চিনতে পারেননি। একা থাকলে অবশ্য ঠিকই পারেন, ভুল হয়ে যায় সঙ্গে কোন মাতব্বর থাকলে। তা আমরা কিছু মনে করিনে। বরং অনেক সময়েই যে চিনতে পারেন, তার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করি।

কঠিন দৃষ্টিতে স্মিতা সনাতনের মুখের দিকে তাকাল। সে দাঁড়িয়েছিল। তাই দেখে সনাতন বলল: চলুন।

সেনদম্পতিকে অনুসরণ করে স্মিতারাও বাড়ির সামনে উপস্থিত হল। কিন্তু তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য কেউই এগিয়ে এলনা। মনোহর ভিতরে চলে গেছে। বাইরে কেউ অপেক্ষা করছেনা।

স্মিতা বলল: একটু পা চালিয়ে এলে ভাল হত। ওঁরা ভেতরে যাবার আগে আগে।

সনাতন সে কথার উত্তর না দিয়ে ডাকল: বেয়ারা!

বেয়ারার বদলে মনোহর এল বাহিরে। প্রশ্ন করল। কাকে চাই?

গম্ভীর ভাবে সনাতন বলল: মিস্টার চোপরাকে।

তিনি বেরিয়ে গেছেন।

স্মিতা পিছনে ছিল! সঙ্কুচিতভাবে বলল: মিসেস চোপরাও চিনতে পারবেন।

বলিষ্ঠভাবে সনাতন বলল: আমরা নিমন্ত্রিত।

আই সী।

বলে মনোহর চারদিকে চাইল।

মিসেস চোপরা এই সময়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন: এস এস।

স্মিতা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মনোহরের পাশ দিয়ে গিয়ে মিসেস চোপরার কাছে পৌঁছল। সনাতন চেয়ে ছিল মনোহরের চোখের দিকে। স্মিতা তাকে আড়াল করে ছিল। ভালকরে এতক্ষণ দেখতে পায়নি। এবারে তাকে স্পষ্ট ভাবে দেখল। অনেকক্ষণ ধরে দেখল।

মিসেস চোপরা মনোহরকে বললেন: মিস ব্যানার্জি আর মিস্টার গোস্বামী।

মনোহর আধখানা বেঁকে তার ডান হাতখানা স্মিতার দিকে বাড়িয়ে দিল। সনাতন দেখল, স্মিতা তার নিজের হাতখানা টেনে নিতে পারলনা। এগিয়ে দিল। মনোহরের হাতের ভিতর বোধহয় একটু কেঁপেও উঠল।

তারপর সনাতনের দিকে হাত বাড়াল। গম্ভীরভাবে সনাতন বলল: নমস্কার।

বসবার ঘরে আরও অভ্যাগত ছিলেন। এবারে আর মিসেস চোপরার প্রয়োজন হলনা। মনোহর নিজেই সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। সেন দম্পতি ছাড়াও ছিলেন কাপুর দম্পতি। মিসেস চোপরার বন্ধু। দিল্লীর বড় ব্যবসাদার। বিলেতের সঙ্গেও তাঁর কারবার চলে।

মনোহর তার পিতার অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। মন্ত্রী মশায়ের বাড়ি চিনতে অসুবিধে হতে পারে। তাই আনতে গেছেন। মোটরে আসবেন, কাজেই দেরি হবেনা।

সনাতন শুধু একবার স্মিতার মুখের দিকে তাকাল।

মনোহর তার ঘড়ি দেখল। সাতটা তো বাজল। মন্ত্রী মশাই আসছেননা। বাইরে কোন সাড়া শব্দও নেই। ডাকল ঃ বেয়ারা।

বেয়ারা পর্দার আড়ালে ছিল। চেরা পর্দার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়াতেই সে নিজের আঙুল দুটো তুলল ঠোঁট পর্যন্ত। পানীয় চাই।

মিস্টার কাপুর বললেন ঃ একটু অপেক্ষা করবেনা ?

মনোহর বলল ঃ উই উইল হ্যাভ সাম মোর রাউণ্ড্স্।

পানীয় যে সাজানো ছিল, তা বুঝতে কারও কষ্ট হলনা। মনোহর নিজে উঠে বেয়ারার হাত থেকে ট্রে নিল। প্রথমেই ধরল স্মিতার সামনে। ছোট গেলাসে রঙীন জল। স্মিতার বুক দুর দুর করে উঠল। গেলাসটা হাত থেকে পড়ে যাবেনা তো! এক মুহূর্ত ইতস্তত করে একটা গেলাস তুলে নিল। মনোহরের দৃষ্টি হল উজ্জ্বল।

সনাতন বলল ঃ না।

মায়া মাথা নাড়ল।

সেন বলল ঃ খাইনে।

মনোহর একটা ভেংচি কেটে মিস্টার ও মিসেস কাপুরকে দিতে গেল।

স্মিতা অসহায় ভাবে সনাতনের দিকে চাইল। সনাতন তার গ্লাসটা নিয়ে বেয়ারার হাতে দিয়ে এল। বেয়ারা রেখে এল পাশের ঘরে।

বেয়ারার হাতে ট্রেটা সমর্পণ করে মনোহর নিজে একটা গ্লাস নিল। বসল মিস্টার কাপুরের পাশে। স্মিতাকে মুখোমুখি দেখা যায়। মিসেস চোপরা কিছু নেননি। বসে বসে মিসেস কাপুরের হাতের গেলাস দেখতে লাগলেন।

মনোহর বলল ঃ সেন একেবারে অচল ছেলে। বিলেতের ঐ ঠাণ্ডায় কফি খেত। বলত, শৌখিন জিনিস খাবার পয়সা কোথায়! খাওয়াতে চাইলেও খেতনা। বলত, একবার সুখ পেলে যে নিজে কিনে খেতে হবে।

হঠাৎ তার নজর পড়ল যে স্মিতার হাতে গেলাস নেই।

হাউ স্ট্রেঞ্জ!

কিন্তু সনাতনের চোখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই থেমে গেল।

মিস্টার কাপুর বললেন ঃ মন্ত্রী হয়তো এখুনি এসে পড়বেন।

মনোহর ততক্ষণে তার নিজের গেলাস শেষ করে আর একটা গেলাস নিয়ে এসেছে। বলল ঃ কিন্তু সেনের একটা গুণ ছিল। আর দশ জনের মতো কোনদিন আমাকে জ্ঞান দেয়নি।

নিজের রসিকতায় নিজেই সে হেসে উঠল।

মিসেস চোপরা তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলেন। বেয়ারাকে কী নির্দেশ দিয়ে আবার তিনি ফিরে এলেন। মিস্টার কাপুর তার প্রথম গেলাসটা শেষ করবার আগেই মনোহর আবার ভিতরে গেল। কিন্তু ফিরে এল খালি হাতে।

সনাতন শ্যেন দৃষ্টিতে এই সব লক্ষ্য করছে। এইবারে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের চেয়ারটা স্মিতাকে ছেড়ে দিল। স্মিতা তার উঠে দাঁড়াবার অর্থ বুঝতে পারেনি। তাই তাকে মায়ার পাশে এসে বসতে

বলল। মনে হল, এই ব্যবধানটুকু সে ইচ্ছে করেই রচনা করেছিল। এখন তার প্রয়োজন নেই দেখেই সরে বসল।

মায়ার পাশে বসে স্মিতার ভাল লাগল। অনেক সহজ অনেক সুস্থ মনে হল নিজেকে। বলল: আপনারা মেরিনা হোটেলে বুঝি উঠেছেন?

ঠিক তাই। কিন্তু আপনারা জানলেন কী করে?

ওই হোটেল থেকে যে আপনাদের বেরতে দেখলাম। আমরা আপনাদের অনুসরণ করে এসেছি।

মায়া বলল: আপনারা বুঝি আরও দূরে থাকেন?

ছোট সিমলায় আমাদের বাড়ি।

মিস্টার গোস্বামীরও?

মায়ার প্রশ্ন শুনে স্মিতার হঠাৎ মনে হল যে সনাতনের সঙ্গে বুঝি তার একটা সম্বন্ধের সন্দেহ এরা করেছেন। তাই তাড়াতাড়ি বলল: সনাতনবাবু কাছেই থাকেন। এঁরও নিমন্ত্রণ ছিল, তাই বাবা বললেন—

মায়া হাসল এই কৈফিয়তের সুর শুনে। সনাতনও হাসল।

রাগে স্মিতার গা জ্বলে যায়। এই বেহায়া লোকটা এমন করে হাসল যেন তার কত প্রিয় সঙ্গী। বলল: বাবা রাজী হলে আমি তাঁরই সঙ্গে আসতাম।

নিমন্ত্রণ যে গান গাইবার, সনাতন সে কথা বললনা।

মিসেস চোপরা মিসেস কাপুরের পাশে বসেছিলেন। মিসেস কাপুর তাঁর গেলাসে একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছেন। বললেন: তুমি যে হঠাৎ এমন তপস্বী হয়ে যাবে, আমরা তা ভাবতে পারিনি।

মিসেস চোপরা তাঁর কানের কাছে মুখ এনে বললেন: কী করব ভাই, প্রাণের দায়ে হয়েছি।

দায়টা আবার কিসের ?

সে তুমি বুঝবেনা। তোমার তো—

মিসেস চোপরা বাকিটুকু শেষ করলেননা।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে মিসেস কাপুর বললেন : কবে থেকে ছাড়লে ?

এ কথার উত্তর দেবার দরকার হলনা। বাইরে মিস্টার চোপরার গলা শোনা গেল। মন্ত্রীমশায়কে নিয়ে তিনি আসছেন। সবাই বারান্দায় বেরিয়ে পড়লেন। মিস্টার কাপুর হাতখানা বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন : এস এস মিনিষ্টার সাহেব।

মন্ত্রীমশায় খুব অন্তরঙ্গ ভাবে তাঁর হাতখানা চেপে ধরলেন। আর সবার নমস্কারের উত্তরে নমস্কার করলেন হাত জোড় করে।

মিস্টার কাপুর বললেন : একা কেন ?

উত্তরে মন্ত্রীমশায় হাসলেন।

যথারীতি পরিচয় হবার পর মিস্টার চোপরা ডাকলেন : বেয়ারা !

বেয়ারা পানীয় আনছিল। মিস্টার কাপুর বললেন : ছোট গেলাসে ওঁর চলবেনা হে, বোতল বার কর।

আইডিয়া !

বলে মনোহর নিজে লাগল উঠে পড়ে।

পাশে থেকে মিস্টার চোপরা বললেন : কী রকম অ্যাকটিভ দেখেছেন স্যার। এটা বিলেতের আবহাওয়ার গুণ।

কী করছে ছেলে ?

এইতো স্যার পরশু দিন ফিরল, এইবার আপনার কাছে নিয়ে যাব।

কী শিখে এল ?

উত্তর দিতে মিস্টার চোপরা এক মুহূর্ত দেরি করলেননা। বললেন : স্যোসাল ওয়েলফেয়ার।

সাবাস। ওয়েলফেয়ার স্টেটে এইরকম লোকেরই দরকার। দিল্লীতে আমার সঙ্গে দেখা করতে ব'লো।

আজ্ঞে নিশ্চয়ই দেখা করবে। আমি নিজে নিয়ে যাব।

সামনে গোটাকয়েক মদের বোতল খুলে দিয়ে মনোহর সেনকে ডাকল ঃ এই দিকে।

সেন উঠে পড়ল। সঙ্গে মায়াও উঠল। স্মিতা তাকাল সনাতনের দিকে।

মনোহর বলল ঃ আপনারাও আসুননা।

মিস্টার চোপরা বললেন ঃ তোমরা বুঝি পাশের ঘরে বসবে? তাই কর।

মনোহর আগে থেকেই ভিতরের বারান্দায় ব্যবস্থা রেখেছিল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বলল ঃ তোমরা কেউই আমাকে কম্পানি দেবেনা!

বলে স্মিতার দিকে তাকাল।

স্মিতার কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল, কিন্তু উত্তর দিতে পারলনা। সনাতনের দিকে তাকাল সাহায্যের জন্য।

উত্তর সেন দিল ঃ রোমে রোম্যানদের মত চল।

খানিকটা তফাতে গেটের পাশে একটা ছোট ঘরের ভিতর থেকে অ্যালসেসিয়ানের ডাক শোনা যাচ্ছিল। কুকুরটা চেন বাঁধা আছে। তারই পাশে সনাতন একখানা চট টাঙানো দেখল। নিচু একটুখানি ঘরের মতো। হঠাৎ মনে হল, তার ভিতর থেকে শিশুর কান্নাও শোনা যাচ্ছে। সনাতন সেদিকে এগিয়ে গেল।

কাছে গিয়ে সনাতনের কিছুই বুঝতে বাকি রইলনা। সপরিবারে মালী ঐ চটের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। তার ঘরখানা ছেড়ে

দিয়েছে কুকুরকে। নিশ্চয়ই মালিকের হুকুম। আড়চোখে শুধু একবার স্মিতাকে দেখল।

স্মিতার কানে কানে সনাতন বলল: আমাদের কর্তব্য ভুললে চলবেনা। এই সময়ে জেনে নেওয়া যাক।

সনাতন ঘরের ভিতর ঢুকল। পিছনে স্মিতা। মিস্টার চোপরাকে জিজ্ঞাসা করল: আমাদের আর দরকার নেই তো!

মিস্টার চোপরা মন্ত্রী মশায়ের দিকে চেয়ে বললেন: একটু গান বাজানা?

কান্নাকাটি!

তারপর চোখ তুলে বললেন: নাচ জান?

সনাতন উত্তর দিল: না।

মন্ত্রীমশায় এমন একটি শব্দ করলেন যে তাতেই তাঁর মত জানা গেল। সনাতন আর এক মুহূর্ত দেরি করলনা, বলল: চলে আসুন।

স্মিতা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে না এলে বোধহয় হাত ধরেই সে টেনে আনত।

বাহিরে বেরিয়ে স্মিতা বলল: ওঁদের অনুমতি নিয়ে এলে বোধহয় ভাল হত।

সনাতন কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিল: কী ভাল হত তা আমি জানি।

সিমলার সন্ধ্যা তখন শীতার্ত হচ্ছে।

এগার

স্মিতা জানত যে মনোহর তার খোঁজ করতে আসবে। সে তার অনুমতি নিয়ে ফেরেনি, ফেরার কথা তাকে জানাবারও সুযোগ পায়নি। নিশ্চয়ই খুব অভদ্রতা হয়েছে। সনাতনের জন্যই এই অভদ্রতা তাকে করতে হল।

এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে স্মিতার বাবা মা দুজনেই খুব আশ্চর্য হলেন। মা বললেনঃ কিরে বাড়ি খুঁজে পেলিনে?

উত্তর না দিয়ে স্মিতা কাপড় বদলাতে গেল। সনাতন বললঃ গান গাইতে হলনা।

কেন?

ওঁদের মুজরোর শখ। তাই ছুটি দিয়ে দিলেন।

স্মিতা আবার ঘুরে এল। বললঃ ছুটি দিয়ে দিলেন বলবেননা, বলুন, চলে এলাম। কেন এলেন, তাও বলতে পারেন।

তা ঠিক। আমাদের প্রয়োজন নেই দেখে আমরা নিজেরাই চলে এসেছি।

হরিহরবাবু বোধহয় খুশী হলেন। মা বললেনঃ নিশ্চয়ই খেয়ে আসনি!

খেয়ে আমরা আসতে পারতুম। দুজনের বাড়তি খাবার বোধহয় ছিল।

বাধা দিয়ে স্মিতা বললঃ আপনি এমন করে কথা বলছেন যেন ওঁরা আমাদের অসম্মান করেছেন।

তাও করেননি। কিন্তু আমরা কোন্ দাবীতে খেতুম?

আমরা নিমন্ত্রিত।

সে তো খাবার জন্যে নয়, সে গানের জন্যে। আর এক ধাপ নিচের মানুষ হলে খাবার পরে দুটো করে টাকাও বকশিশ নিয়ে আসতে পারতুম।

স্মিতা তবু কথা কইল, বলল: এ আপনার একটা কম্‌প্লেক্স। নিজেকে আপনি ছোট ভাবেন।

ঠিক উল্টো। নিজেকে আমি ছোট ভাবতে পারিনে। একজন মানুষ আর একজনকে ছোট ভাববে, তাও আমি সইতে পারিনে।

হরিহরবাবুর আজ সনাতনকে ভাল লাগল; বললেন: তুমি আজ আমার বাড়িতে খাবে সনাতন। দুখানা রুটি আর একটু ডাল।

আজ থাক বাঁড়ুয্যে মশাই, আজ আমি উপোস করব।

বলে উঠে দাঁড়াল।

সে কি! আজ তুমি অভুক্ত থাকবে?

শান্ত গলায় সনাতন বলল: তার জন্যে আপনি ভাববেন না। আমার অভ্যাস আছে। দেশের অনেক হতভাগারই আছে।

হরিহরবাবু জানেন যে সনাতনকে অনুরোধ করা বৃথা।

পরদিন সকালেই বাড়ি খুঁজে খুঁজে মনোহর এসে উপস্থিত হল। সামনের বারান্দায় এক ফালি রোদ এসে পড়েছে। হরিহরবাবু সেই রোদে পিঠ দিয়ে বসেছেন। গায়ে গরম তুস, ডান হাত একটুখানি বার করে একখানা বই ধরে আছেন, চোখে চশমা। তিনি লক্ষ্য করছিলেন যে একজন পথচারীকে প্রশ্ন করে মনোহর তাঁর বাড়ি এল। হরিহরবাবু বই নামিয়ে চোখ তুললেন: কাকে চাই?

মিস্টার ব্যানার্জিকে।

আমিই হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। কী দরকার বলুন।

মনোহর চেয়ে দেখল, কাছে আর একখানা চেয়ার নেই। হরিহরবাবুও তাকে বসতে বললেন না! নিজের চেহারার দিকে

আপাদ মস্তক চেয়ে দেখল, কোথাও ত্রুটি আছে কিনা। তাও চোখে পড়লনা। এমন একজন খাঁটি সাহেবকে এরা যথাযোগ্য সম্মান দেবেনা! ভারতবাসীর হল কী! তবু গরজটা যখন নিজের, তখন উত্তর একটা দিতেই হবে। মনোহর বলল: মিস ব্যানার্জি আমাকে চিনবেন।

হরিহরবাবুর কণ্ঠে এবারে উষ্মা প্রকাশ পেল। বললেন: আমার মেয়ে তো পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায় না!

পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ল যে কাল স্মিতা পার্টিতে গিয়েছিল। এই যুবক জুনিয়ার চোপরা নয়তো! স্মিতা ঠিক এই সময়েই বেরিয়ে এল। বলল: আসুন আসুন, কাল আমরা ভারি অন্যায় করেছি।

না না, অন্যায় তো আমরা করেছি।

স্মিতা বলল: আসুন, ভেতরে আসুন। ইনিই মিস্টার চোপরা, বাবা। এঁদের বাড়িতেই কাল আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল।

মনোহর গদগদভাবে তার হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু হরিহরবাবু তাঁর তুসের ভিতর থেকে হাত বার করলেন না। বাঁহাতখানা বুকের কাছে তুলে নমস্কারের ভঙ্গি করলেন।

এবারে সে স্মিতার দিকে হাত বাড়াল। স্মিতা এবার মনোহরের দিকে আর একবার তার বাবার দিকে তাকিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। মনোহর সেই ঘরে আসতেই হাত বাড়িয়ে বসতে বলল। মনোহর আগে তার হাতখানা ধরল, করমর্দন শেষ করে বসল চেয়ারে।

হরিহরবাবু বুঝতে পারছিলেন না কী করবেন, কী তাঁর করা উচিত। মনোহর এসে তাঁরই তো নাম করেছিল, মেয়ের নাম করেছে পরে। আমাদের দেশের সৌজন্যে কী বলে! ডান হাতের বইখানা বার করে দেখলেন কেনোপনিষদ। এই বইএ তো এ সব কথা নেই! বোধহয় ওঠা উচিত। উঁহু, তাহলে ওরা প্রশ্রয় পাবে। কিন্তু ওরা কারা? মনোহরকে তিনি তো দেখেননি! যাকে দেখতে পারেননা,

সে ওর বাবা। এ যে কথামালার গল্প হচ্ছে—তুই যখন করিসনি তখন তোর বাবা করেছে। সত্যিই তো, এই ছেলেটার কী দোষ! হরিহরবাবু উঠব উঠব করছিলেন, এমন সময় ভিতর থেকে মেয়ের ডাক এল : বাবা!

হরিহরবাবু আর দ্বিধা করলেননা, তুসখানা সামলে নিয়ে ঘরে এসে বসলেন।

ঘরের অন্ধকার তখনও ঘোচেনি। স্মিতা বাতি জ্বেলেছে। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, উপরে টিনের ছাদ। রাস্তার দিকের বারান্দাটা পাকা, পিছনের বারান্দায় বসে খাদের শোভা দেখা যায়। ঝাউ গাছের ফাঁক দিয়ে মেঘ ওঠে, সেই মেঘ জমে পাহাড়ের রঙ বদলে দেয়। ধূসর শ্যামল রঙ হয় ঘন নীল। মানুষেরও মনের রঙ বদলায়। মনোহর উঠে দাঁড়িয়েছিল, হরিহরবাবু বললেন : বস বস।

মনোহর বসল হরিহরবাবু বসবার পরে। বলল : আপনাদের কাছে আজ ক্ষমা চাইতে এসেছি।

হরিহরবাবু আশ্চর্য হলেন, বললেন : কেন?

কেন! আমাদের অপরাধ যে কত গভীর হয়েছে, মিস ব্যানার্জি তা জানেন। তিনি যদি সে কথা প্রকাশ করে না থাকেন তো সে তাঁর উদারতা।

বলে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইল স্মিতার দিকে। হরিহরবাবুও মেয়ের দিকে তাকালেন। স্মিতা তাড়াতাড়ি উত্তর দিল : আমার তো সে রকম কিছু মনে পড়ছেনা!

বললাম তো, এ আপনার উদারতা।

হরিহরবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল : আমার অবশ্য একটু কৈফিয়ৎ আছে। আমি আজ দুদিন হল এসেছি। কাউকেই চিনিনে। আমার অপরাধ আপনাদের ক্ষমা করতেই হবে।

হরিহরবাবু এবারে স্বীকার করলেন : তোমার তো কোন অপরাধ

হয়নি। স্মিতা বলছিল, তারা নিজেরাই তোমাদের না জানিয়ে চলে এসেছে।

স্মিতা বলল: সনাতনবাবু এর জন্যে দায়ী। আমি কালই তাঁকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছি।

তারপর বাপের দিকে ফিরে বলল: তোমরা একটু গল্প কর বাবা, আমি চায়ের ব্যবস্থা করি।

এই কথাটি স্মিতা বাঙলায় বলল। মনোহর ঠিক বুঝতে পারলনা। বলল: আপনি চলে যাচ্ছেন?

স্মিতা হেসে বলল: না, এখুনি ফিরে আসছি।

আশ্বস্ত হয়ে মনোহর হরিহরবাবুর সঙ্গে গল্প শুরু করল। বলল: আপনার পড়ায় আমি ব্যাঘাত করলাম!

হরিহরবাবু বললেন: ব্যাঘাত আর কী, এসব আমার অনেকবার পড়া বই। সময় কাটাতে বার বার পড়ি।

মনোহর বলল: এমন কী বই যে বার বার পড়তে ভাল লাগে?

উপনিষৎ।

কবিতার বই বুঝি?

সংস্কৃত শ্লোক তো কবিতাই। কিন্তু হরিহরবাবুর মনে হল যে হ্যাঁ বললে ঠিক উত্তরটা দেওয়া হবেনা। তাই বললেন: না।

তবে নিশ্চয়ই ডিটেক্‌টিভ বই। অগাথা ক্রিষ্টি বড় ভাল লেখে। গার্ডনার বা চেনির চেয়েও ভাল। সম্প্রতি একটা খবর বেরিয়েছিল তাতে দেখলাম যে ক্রিষ্টি প্রায় সব দেশের সব লেখককেই জনপ্রিয়তায় ছাড়িয়ে গেছে।

হরিহরবাবু এই ক্রিষ্টির নাম শোনেননি। তিনি ভারতের কৃষ্টির কথা জানেন। আজকালকার ছেলে মেয়েরা তা বেমালুম ভুলে গেছে। এ ছেলেটা দেখছেন উপনিষদের নামও শোনেনি। এ দেশের ছেলের মুখে এ কথা শুনলে তিনি কুরুক্ষেত্র বাধাতেন।

চোপরা বলেই সয়ে গেলেন। ছেলেবেলায় বিলেত গেছে, ফিরেছে ছুদিন আগে। কাজেই অপরাধটা তার চেয়ে তার বাপের বেশি। শৈশবে উপযুক্ত শিক্ষা পায়নি। হরিহরবাবু কোন উত্তর দিলেন না।

চায়ের সরঞ্জাম হাতে নিয়ে স্মিতা খানিকক্ষণ পরে ঘরে এল। মনোহর লাফিয়ে উঠল : একি, আপনি নিজে আনছেন? বেয়ারা কোথায়?

স্মিতার মুখ লাল হয়ে উঠল। বলতে পারলনা যে তাদের বেয়ারা নেই। কেউই নেই। মা রাঁধছিলেন। তরকারির কড়াই নামিয়ে চায়ের জল করে দিয়েছেন। স্মিতা সাজিয়ে এনেছে। হরিহরবাবু মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তার লজ্জা দেখতে পেলেন। বললেন : লজ্জা কি মা। নিজের কাজ নিজে করে নেব, এতে লজ্জা কিসের?

মনোহরকে বললেন : আমাদের ঘরে বেয়ারা বাবুর্চি নেই। যখন চাকরি ছিল, তখন একটা পাহাড়ী মেয়ে বাসন মাজত। এখন কেউ নেই।

ততক্ষণে মনোহর চায়ের ট্রে কেড়ে নিয়েছে স্মিতার হাত থেকে। টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে নিজের চেয়ারে বসল। বলল : বিলেতেও এমনি ব্যবস্থা। নিজের কাজ সব নিজেকেই করে নিতে হয়। আমি একটা লোক রেখেছিলুম বলে লোকে আমাকে রাজা ভাবত। কী লজ্জা বলুন।

বাড়ি ফেরার সময় মনোহর সবাইকে ক্লার্ক্সে চায়ের নিমন্ত্রণ করে গেল। বিকেল চারটেয়। কোন ওজর আপত্তি মানলনা। হরিহরবাবু মনে মনে ভাবলেন, ছেলেটি বেশ।

স্মিতা তাকে এগিয়ে দিল।

বারো

বিধায়ক স্মিতাদের বাড়ি এল বিকেল বেলায়। কিন্তু দরজা জানালা সব বন্ধ দেখে আশ্চর্য হল। সামনের দরজায় কিন্তু বড় তালা ঝুলছেনা। ভিতরে নিশ্চয়ই কেউ আছেন। বিধায়ক ডাকল ঃ পল্টু!

কোন সাড়া নেই।

বিধায়ক আরও জোরে ডাকল ঃ পল্টু, ও পল্টু!

কে বিধায়ক!

বলে পল্টুর মা এসে দরজা খুলে দিলেন। বললেন ঃ এস এস।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বিধায়ক বলল ঃ বাড়িতে কেউ নেই বুঝি?

দেখনা কাণ্ড! সবাই মিলে হোটেলে নেমন্তন্ন খেতে গেছেন।

ঘটনাটা বুঝতে বিধায়কের সময় লাগল। কিন্তু বোঝবার পরে বেশ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল ঃ আপনি গেলেননা?

পাগল হয়েছ, আমি হোটেলে যাব নেমন্তন্ন খেতে!

তা বটে।

বিধায়ক ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর প্রশ্ন করল ঃ নিশ্চয়ই কোন উপলক্ষ্য আছে!

থাকলে বলতো।

তবে?

কাল ওরা না খেয়ে ফিরেছে, বোধহয় সেইজন্যেই বলেছে।

সনাতনকেও বলেছে তাহলে?

তাতো জানিনে।

বেশিক্ষণ অন্ধকারে হাঁতড়াতে হলনা। হরিহরবাবু পল্টুকে নিয়ে

ফিরে এলেন। স্মিতা এলনা। তাই দেখে স্মিতার মায়ের আর বিস্ময়ের অন্ত রইলনা। বললেন: স্মিতাকে কোথায় ফেলে এলে?

ফেলে কি এলাম, ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

তারপরেই তিনি ঘটনাটা খুলে বললেন: চায়ের পরে মনোহর ধরে বসল যে সিনেমায় যেতে হবে। কিছুতেই ছাড়বেনা। তুমিই বল, আমি কখনও সিনেমায় যাই, না পল্টুকেই যেতে দিতে পারি।

তাই বলে একটা নতুন ছেলের সঙ্গে মেয়েটাকে ছেড়ে দিলে?

পল্টু বলে উঠল: দিদির সঙ্গে আমি যেতে চেয়েছিলাম মা।

সত্যিইতো: সরোজিনী বললেন: এই ছেলেটাকে সঙ্গে দিলেও তো পারতে!

পল্টুকে! এইটুকু বয়সে ছেলে সিনেমায় যাবে! তাহলে লেখা পড়া কিছু হবে, না মানুষ হবে ভবিষ্যতে!

সরোজিনী রেগে গেলেন। বললেন: তবে মেয়েটাকে কেন যেতে দিলে!

ইচ্ছে করে কি দিলুম, তুমি থাকলেও বাধ্য হতে।

পল্টু বলল: দেখছতো বাবা, আমি দিদির সঙ্গে থাকলে কিছুই ঝামেলা হতনা।

হরিহরবাবু রুষ্ট দৃষ্টিতে ছেলের চোখের দিকে চাইলেন। পল্টু পালিয়ে গেল।

বিধায়ক আকাশ পাতাল ভাবছিল। ভাবছিল, মানুষের ক্ষমতার কথা। একটা লোক একদিনে কত আত্মীয় হতে পারে। এমন একটা রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েকে কত সহজেই সে সিনেমায় নিয়ে গেল। বাপ মায়ের সমস্ত অসম্মতি গেল তুচ্ছ হয়ে। বিধায়ক নিজের সঙ্গে তুলনা করে। তার সঙ্গে এই পরিবারের সম্বন্ধ কত দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে। হরিহরবাবু নিজে তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, দিয়েছেন মেয়ের মা। তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিধায়ক

আজও কিছু করেনা। আজও সে সব কিছুর জন্য অনুমতির অপেক্ষা রাখে। বিধায়ক ভাবছিল, কোনটা স্বাভাবিক। জগৎটাতো এক. জায়গায় থেমে নেই, রোজই এগিয়ে চলেছে। কাজেই তার রীতি নীতিও পালটাচ্ছে। বিধায়ক কি এখনও আগের যুগটাকেই আঁকড়ে আছে! বিচিত্র নয়! ছোট চোপরা সত্ত ফিরেছে বিলেত থেকে। ও দেশটা নাকি এগিয়ে চলে। এগিয়ে চলতেই ভালবাসে। সভ্যতার মিছিলে ওরা এত এগিয়ে আছে যে আমরা তাদের দেখতে পাইনে। ছুটে গিয়েও কোনদিন ধরতে পারব কিনা জানিনে। এই হল বিদেশের মত। কিন্তু আমাদের মত অন্য রকম। ওদের মিছিল যে পথে বেরিয়েছে সে তো নতুন পথে নয়। ওরা তো পুরনো পথেই ফিরে চলেছে। পৃথিবীর পূর্ব দিকে উঠেছিল সভ্যতার সূর্য। ওরা সেই সূর্যকে অনুসরণ করে পশ্চিমের দিকে ছুটেছে। সূর্যাস্তের পর ওরা গভীর অন্ধকারে ঢাকা পড়বে। আদিম অন্ধকার। বন্য। নিষ্ঠুর। ভারতের অন্য অন্বেষণ। ভারত পূর্ব দিগন্তে চেয়ে উচ্চারণ করেছিল, প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্। ঐ জ্যোতির্ময়ের প্রকাশের পিছনে যে সত্য আছে, তাকেই সে আবিষ্কার করতে চেয়েছিল। একবার সে সত্য আবিষ্কৃত হলে সভ্যতার সূর্য কোনদিন অস্ত যাবেনা। পৃথিবীর মুক্তি হবে আধ্যাত্মিক চেতনায়।

হরিহরবাবু অনেকক্ষণ পরে বললেন: তুমি কি রাগ করলে?

আমি!

বিধায়ক চমকে উঠল। চারিদিকে চেয়ে বুঝল যে মাঝখানে বোধহয় অনেকটা সময় কেটে গেছে। স্মিতার মা বেরিয়ে গেছেন। পল্টু তো আগেই পালিয়েছিল। শুধু সে আর হরিহরবাবু পাশা-পাশি বসে আছে। হরিহরবাবু বললেন: আমি তোমার কথাই জিজ্ঞাসা করছি।

বিধায়কের মনে পড়ল যে তারা স্মিতার সিনেমা যাবার কথা

আলোচনা করছিল। স্মিতার মা এই কাজ সমর্থন করেননি। তিনি তো পুরোনো যুগের মানুষ! কিন্তু বিধায়কের কী আপত্তি থাকতে পারে। সেও তো স্মিতাকে নিয়ে সিনেমায় গেছে। তাতে হরিহরবাবু কোনদিন আপত্তি করেননি। আজও করবেননা। স্মিতার-মাতো খুশীই হন। বলেন, মেয়েটা একা একা থাকে। বেশ তো, ঘুরেই আসুকনা তোমার সঙ্গে। বিধায়ক ভাবল, তার সঙ্গে ছোট চোপরার অনেক তফাৎ আছে। স্মিতা একদিন তারই সঙ্গে ঘর করবে, ছোট চোপরার সঙ্গে নয়। স্মিতার বাপ মা তাই তাকে যে স্বাধীনতা দিতে পারেন, ছোট চোপরাকে তা পারেননা। সেও কি স্মিতার অবাধ স্বাধীনতায় আপত্তি করতে পারেনা! হরিহরবাবু বুঝি এই প্রশ্ন করে তাকে তার অধিকারের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। বিধায়ক এক মুহূর্ত ভাবল। তার দাবী জানানো উচিত কিনা। কিন্তু স্মিতার কথা ভেবেই মিইয়ে গেল। স্মিতাকে তো চোপরা জোর করে ধরে নিয়ে যায়নি। সে স্বেচ্ছায় গেছে। ইচ্ছে করলেই সে তার বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরতে পারত। তা যখন ফেরেনি, তখন বিধায়ক কার উপর রাগ করবে! মানুষের মনের উপর তো জোর খাটেনা, দেহটাকে টানাটানি করে লাভ কী! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিধায়ক বলল : রাগ কেন করব!

হরিহরবাবু প্রাচীন হয়েছেন। বিধায়ক উত্তর না দিলেও তার মনের কথা বুঝতে পারতেন। বললেন : তোমার রাগ করবার কারণ আছে বৈকি!

বিধায়ক চোপরাকে দেখেনি। তার সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল তার ছিল। কিন্তু সনাতনকে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়না। তার কথার এত ধার, যে শুধু দেহ নয় মনও ক্ষত বিক্ষত হয়। সে বলে, প্রাণ বলে একটা বস্তু আছে, তার শক্তি অমিত। একটা কেন, অসংখ্য প্রাণ সে অনায়াসে আচ্ছন্ন করতে পারে। বিধায়কের

'সেই প্রাণ বড় স্তিমিত। একটা মেয়ের প্রাণও সে আচ্ছন্ন করতে পারল না। ছোট চোপরার প্রাণশক্তি কি সনাতন দেখতে পেয়েছে? বিধায়ক জিজ্ঞাসা করল: ছোট চোপরাকে কেমন দেখলেন?

কেমন দেখলুম: হরিহরবাবু চিন্তিতভাবে বললেন: যেমন শুনেছিলুম ঠিক তেমনটি নয়। বেশ বিনয়ী, সভ্য, আর সব চেয়ে ভাল লাগল তার অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টাটি! ওর সম্বন্ধে অত শোনার পরও তাকে খারাপ ভাবতে পারলুমনা।

একটু থেমে বললেন: তুমি বিশ্বাস কর বিধায়ক, ওর বাপকে আমি দু চক্ষে দেখতে পারিনে। যতদিন ওর নিচে কাজ করেছি, ততদিন কোন গুণ ওর শরীরে দেখিনি। একটুখানি মানিয়ে চললে আর একটু ওপরেও উঠতে পারতুম। কিন্তু কিছুতেই তা পারিনি। এই ছেলেটাকে একেবারে অন্যরকম মনে হল। একেবারে নিরভিমান। হোটেলের দরজায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে তার আনন্দ আর ধরেনা। নিজের হাতে সবার ওভারকোট খুলে নিল। এটা বুঝি ভদ্রতা?

বিধায়ক এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। এবারে সবিস্ময়ে দেখল, হরিহর-বাবু ধুতি পাঞ্জাবীর উপর চাদর জড়িয়ে যাননি, গেছেন ট্রাউজারের উপর ওভারকোট চাপিয়ে! বিধায়কের এই বিস্ময় লক্ষ্য করে হরিহরবাবু তাড়াতাড়ি বললেন: বুঝলেনা বিধায়ক, হোটেলে নিমন্ত্রণ বলেই কোট পাৎলুম পরলুম। সে সব দিন তো তুমি দেখনি। রিজের উপর পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকত, ধুতি পরা মানুষকে গলা ধাক্কা দিয়ে নামাত নিচের রাস্তায়। সাধ্য কি এ সব হোটেলে কেউ ধুতি পরে ঢোকে!

একই নিঃশ্বাসে যোগ করলেন: ও হোটেলে যে আজকাল ধুতি পরেও যাওয়া চলে, সে কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। আর আজ

ঠাণ্ডাটাও যেন বেশি ছিল। বিকেল থেকেই শীত করছিল। অনেকদিন পরে এই সব পরে বেশ আরাম পেয়েছি।

বিধায়ক জিজ্ঞাসা করতে পারত, তবে ওভারকোট খুললেন কেন। কিন্তু সে প্রশ্নে হরিহরবাবু বিব্রত হবেন ভেবে নীরব রইল। হরিহরবাবুর যে আজকের বিকেলটি ভাল লেগেছে, তা তাঁর গল্প শুনেই বোঝা গেল। এক সঙ্গে এত কথা তিনি বলেননা। কিন্তু আজ প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন যে মনোহর চোপরা ছেলেটি সত্যি ভাল। বললেন ঃ বুঝলে বিধায়ক, বিলেত ফেরৎ ছেলে বলে তাকে একবারও মনে হলনা। চাল চালিয়াতি একেবারে নেই। মদতো ছুঁলইনা, সিগারেটও খেলনা। অথচ দেখ, তার সম্বন্ধে কত কথাই না শুনেছিলুম। লোকে নিন্দে করতে পারলে আর কিছু চায়না।

হরিহরবাবুর সম্বন্ধে বিধায়কের ধারণা খুব অস্পষ্ট নয়। তাঁর যখন যাকে ভাল লাগে, তখন এমনি করেই লাগে। খারাপ লাগলে তার সব কিছুই খারাপ। সবটুকু বিধায়ক অবিশ্বাস করলনা। হয়তো ছেলেটা ভালই। কিংবা প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা। মানুষকে ভোলাতে পারে অনায়াসে। কিছুদিন না গেলে সঠিক বলা যায়না।

হরিহরবাবুর হঠাৎ বিধায়কের দিকে নজর পড়ল। বললেন ঃ তোমাকে আজ বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে!

বিধায়ক বলল ঃ সত্যিই ক্লান্ত। অফিসে খুব খাটুনি গেছে।

বলেই উঠে দাঁড়াল।

সেকি, এরই মধ্যে উঠবে! একটু চা—

আজ থাক। আজ বিশ্রাম ছাড়া আর কিছু ভাল লাগছেনা।

হরিহরবাবুও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বিধায়ক তো ক্লান্তির কথা কখনও বলেনি। তার শরীর তো আজ খারাপ হয়নি! কোন অসুখ!

বিধায়ক বেরিয়ে গেল।

চায়ের পেয়ালা হাতে স্মিতার মা এসে আশ্চর্য হলেন! বিধায়ক চলে গেছে?

চেয়ারে বসে পড়ে হরিহরবাবু বললেনঃ হ্যাঁ।

চলে গেল! তাকে একটু বসাতে পারলে না!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হরিহরবাবু বললেনঃ বসলনা।

তের

স্মিতার মনে হল, মনোহরের সব ব্যাপারেই একটু বেশি তাড়া। জীবনের একটা মুহূর্তও বুঝি সে নষ্ট করতে চায়না। তা না হলে একঘর লোকের ভিতর সে অমন কাণ্ড করতে পারে! হলই বা সে অন্ধকার ঘর! স্মিতা অনেকক্ষণ ধরে ভাবল, এমন পুরুষ মানুষ সে আগে দেখেছে কিনা। শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহ হল যে নিশ্চয়ই দেখেনি। দেখলে বিধায়ককে সে সেদিন অসভ্য ভাবতনা। বেশি তো নয়, দুজনে চলতে চলতে সে তার হাতখানিই শুধু বাড়িয়ে দিয়েছিল। স্মিতা তার নিজের হাত এগিয়ে দিতে পারেনি। বরং অসভ্যতা ভেবে নিজের হাত গুটিয়ে নিয়েছিল অতর্কিতে। মনোহর লোকটা একেবারে অন্য রকমের। তার চাওয়ার পিছনে যেন একটা দাবী আছে। হাত যখন ধরতে চায় তখন ধরবেই। হাত বাড়িয়ে না দিলে জোর করেই হাত টেনে নেবে। স্মিতা তার দৃষ্টিতে এই রকমের সংকল্প দেখে ভয়ে ভয়েই হাত বাড়িয়ে দেয়।

হঠাৎ একজন নতুন লোকের সঙ্গে সিনেমায় আসতে তার আপত্তি ছিল। ভয়ও ছিল। যে লোকটা এমন স্পষ্টভাবে দাবী জানাতে পারে তার অসাধ্য কাজ নেই। বাবার উপরে তার যথেষ্ট ভরসা ছিল। স্মিতাকে নিশ্চয়ই তিনি একা ছেড়ে দেবেননা। যিনি নিজে কোনদিন সিনেমা দেখেন না, পল্টুকে দেখতে দেন না, তাঁর বিরাগের কথা কারও অজ্ঞাত নেই। বিধায়ক এখনও ভয়ে ভয়ে প্রস্তাব করে। মন বুঝে মেজাজ বুঝে। কিন্তু মনোহর তো এ সব কিছু ভাবলনা। সরাসরি সিনেমায় যাবার প্রস্তাব করল, জোর করল। স্মিতা জানে যে পরিচিত কেউ হলে তার বাবা ক্ষেপে

উঠতেন। কিন্তু মনোহরের উপর রাগ করতে পারলেননা। একবারও বলতে পারলেননা যে স্মিতা যাবেনা, স্মিতাকে যেতে দেবেননা। পল্টুর হাত ধরে শুধু ফিরে গেলেন।

বাবার এই পরিবর্তনটা স্মিতার কাছে বড় আশ্চর্যের বোধহয়। যাঁর দৃঢ়তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, তিনি একটা নতুন লোকের কাছে এমন দুর্বল হয়ে গেলেন! স্মিতার হঠাৎ নিজের কথা মনে পড়ল। কাল সন্ধ্যেবেলায় মনোহর যখন মদের গ্লাস এনে সামনে ধরেছিল, কেউ নেবার আগে স্মিতা একটা গ্লাস তুলে নিয়েছিল। কী করা উচিত বুঝতে না পেরেই বোধহয় নিয়েছিল। না নিলে অভদ্রতা হবে, কিংবা অপমান করা হবে, এই আশঙ্কাতেই বোধ-হয় নিয়েছিল। স্মিতা মদ কোনদিন খায়নি, কোনদিন খাবে এ তার কাছে স্বপ্নাতীত ব্যাপার। শুধু নিয়েছিল। বোধহয় দুর্বল বলেই নিয়েছিল। এই দুর্বলতাকে জয় করতে না পারলে তো চলবেনা। মিসেস সেনকে সে দেখেছে, দেখেছে মিস্টার সেনকেও। তাঁরা মদের গ্লাস তুলে নেননি। সনাতনও নেয়নি। তাঁরা যদি সবল হতে পারেন, স্মিতাই বা কেন পারবেনা! মনে মনে স্মিতা খুশী হয়ে উঠল যে একটু আগে সে তার মনোবল দেখাতে পেরেছে। বাধা দিয়েছে মনোহরকে। লোকটা সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি করেছিল, অতটা প্রশ্রয় দেওয়া চলেনা। তাদের চারিদিক ঘিরে কত লোকই বসেছে। তাদের কেউ তো মনোহরের মতো করেনা। হোক না অন্ধকার!

খানিকক্ষণ আগে স্মিতা ঘেমে উঠেছিল। তার মনে হয়েছিল বুকের ভিতর তার হৃৎপিণ্ডের কাজ হঠাৎ থেমে যাবে। উঃ সে কী অনুভূতি! জীবনের সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। মনোহর তার চেয়ারের হাতলে হাত রেখেছিল। রাখুক। তারপর সেই হাত রাখল তার চেয়ারের পিঠে। তাতেও ক্ষতি নেই। স্মিতা কাঠ

হয়ে বসেছিল। তার মনে হচ্ছিল, ঐ হাত এবারে তার পিঠে খসে পড়বে। কিন্তু তা পড়লনা। মনোহর তার হাতখানা রাখল তার কাঁধের উপর। খুব আলতো ভাবে। কিন্তু স্মিতা শিউরে উঠে ছিটকে সরে গেল, চেয়ারের এ পাশ থেকে ওপাশে। মনোহরও তার হাত গুটিয়ে নিল।

স্মিতার বুক টিপ টিপ করে কাঁপছিল। আবার হয়তো লোকটা তার হাত বাড়াবে! কিন্তু সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। নিজেকে সে এত খেলো করতে পারবেনা।

মনোহর তার এই আড়ষ্ট ভাব লক্ষ্য করে বলল: আমি খুব দুঃখিত।

খুব আস্তে আস্তে বলল কথা কটি। পাশের লোক যেন শুনতে না পায় এমনি সাবধানে।

স্মিতা উত্তর দিলনা।

বিলেতের কথা মনোহরের মনে পড়ল। ও দেশেও আছে দু জাতের মেয়ে। এক জাত ঠিক স্মিতারই মতন। সাধারণত তারা কন্টিনেন্টের মেয়ে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে শরীরটা তারা মুক্ত করে নেয়, আর হয়তো আসেনা। আরও একটা জাত আছে, তারা সরে যায়না, কাঁধের উপর থেকে হাতটা এমন করে সরিয়ে দেয়না। বিলেতের অনেক মেয়ে এসেছে কাছে ঘনিয়ে।

মনোহর একটুও লজ্জিত হয়নি। লজ্জা পাবার কী আছে! একদিনের পরিচয়ে যে একা তার সঙ্গে ছবি দেখছে, এই যথেষ্ট। ভারতবর্ষের মেয়েকে একটু সময় দেওয়া দরকার। সে কথাটা মনে রাখলেই ভাল ছিল। সবুরে মেওয়া ফলে।

মনোহর তার চারদিকে চেয়ে দেখল, সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখছে। কেউ কারও সঙ্গে কথা কইছেনা, কেউ চাইছেনা কারও পানে। কেউ কারও কাঁধে হাত রাখেনি, কাছে

ঘনিয়ে বসেনি। বিলেতে এমন হয়না। বেশি পয়সা দিয়ে যারা পিছনে বসে, তারা ছবি দেখেনা। ছবি দেখাতো একটা উপলক্ষ্য। লক্ষ্য অন্য। সবারই এক লক্ষ্য। এতে কেউ কিছু মনে করেনা। করবে কী! সবাই তো ব্যস্ত। কে কাকে দেখবে! এ দেশের ছবি দেখা দেখে মনোহর ভারি আশ্চর্য হচ্ছে। মানুষের চেয়েও এরা ছবি ভালবাসে!

এক সময়ে আস্তে আস্তে বলল: কেমন দেখছেন?

স্মিতা সংক্ষেপে বলল: ভাল।

মনোহরের মন নেই ছবির পর্দায়। ভাবছিল, এবারে কী বলা যায়। কিছু ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল। বিলেত হলে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে পারত।

ঘরের আবহাওয়া মনোহরের ভাল লাগছেনা। সবাই বড় সিরিয়স। সিনেমা হাউসের চেয়ে এ দেশের রাস্তাগুলোও দেখা যাচ্ছে ভাল। সেখানে কথা কইতে অন্তত বাধা নেই। এমন গম্ভীরভাবে পর্দার দিকে চেয়ে বসে থাকতে হতনা। মনোহরের আর একটা কষ্ট হচ্ছে। অনেকক্ষণ পাইপ ধরাতে পারেনি। বড় বড় অক্ষরে সতর্ক করে দেওয়া আছে, ধূমপান চলবেনা। সিনেমায় লোকে তো স্ফূর্তি করতেই আসে! এ কেমন ধারা স্ফূর্তির ব্যবস্থা!

স্মিতাও আর সহজ হতে পাচ্ছেনা। কাঁধের উপরটা বুঝি এখনও জ্বলছে। একটু হাত বুলিয়ে নেবে! কিন্তু মনোহর কী ভাববে! স্মিতার মনে হল, বিদেশে বোধহয় এসব নিন্দিত নয়। তাহলে এমন অবলীলায় লোকটা হাত রাখতনা। কিন্তু এ দেশটা যে বিলেত নয়, আর স্মিতাও নয় মেম সাহেব।

স্মিতার হঠাৎ খেয়াল হল, এ দেশের অভিজাত মেয়েরা কী করে। মিসেস কাপুরের বড় মেয়ে তারই বয়সী। বলছিলেন, দিল্লীতে সে চাকরি করে। বড় চাকরি। কিন্তু বিয়ে করেনি।

পুজোর ছুটিতে সেও এখানে বেড়াতে আসবে। তার নামটা স্মিতার মনে পড়ছেনা। মিসেস কাপুর খুব আস্তে আস্তে গল্প করছিলেন মিসেস চোপরার সঙ্গে। স্মিতা অনেকটা তফাতে ছিল। সব কথা ভাল শুনতে পায়নি। এইটুকু শুনেছে যে মিসেস কাপুর তাকে আসতে লিখেছেন। স্মিতা জানে, সেই মেয়েটা সিমলায় আসবে, সিনেমায় আসবে মনোহরের সঙ্গে। তারপর মনোহর যখন তার কাঁধে হাত রাখবে আলতো ভাবে, তখন সে কী করবে! মনোহর হাত রাখবেই কিন্তু সেই মেয়েটা কী করবে স্মিতা তা জানেনা। তারই মতো ঝেড়ে ফেলে সরে বসবে, না মুচকি হেসে সরে আসবে। যে মেয়েরা মনোহরদের সঙ্গে মেলা মেশা করে, তাদের সম্বন্ধে স্মিতার কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। একসঙ্গে চা খেয়ে সিনেমায় আসতে রাজী হলেই কি কাঁধে হাত দেবার অধিকার দেওয়া হয়! কী জানি।

স্মিতার আরও একটি কথা মনে হল। এই সামান্য ব্যাপারটাকে সে এত গুরুত্ব কেন দিচ্ছে। হয়তো মনোহরের অনিচ্ছাতেই এই কাণ্ডটা হয়েছে। ইচ্ছাতে হলেই বা বিচলিত হবার কী আছে। সে নিজেই তো এই সমাজের রীতি নীতির সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছে। ভালমন্দ সব কিছুই দেখবে নির্বিচারে। শুরুতেই এমন ভয় পেলে তার চলবে কেন! সাহস সঞ্চয় করে স্মিতা সোজা হয়ে বসল।

কিন্তু মনোহর আর তার হাত বাড়ালনা। বরং সিনেমার বাইরে বেরিয়ে স্মিতার কাছে ক্ষমা চাইল। রিজ থেকে ছোট সিমলার পথে পা বাড়িয়ে বলল: কেন এমন অপরাধ হল জানেন?

স্মিতা কিছু জানতে চাইলনা।

মনোহর নিজেই বলল: বিলেতে প্রথম গিয়েই একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম। একটা খাস বিলিতি মেয়ে নিজে থেকেই সিনেমা

দেখতে চাইল। সাড়ে সাত শিলিং খরচ করে তাকে নিয়ে গেলাম। কিন্তু পাশে বসে সে সারাক্ষণ উসখুস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, তুমি কেমন পুরুষ মানুষ বলতো? তখনও তো ও দেশে আমি নতুন, সব জিনিস ঠিক মতো বুঝতে পারিনি। তাই ভাল ছেলের মতো জিজ্ঞেস করলাম, কোন দোষ করেছি কি? মেয়েটা বড় বিমর্ষ হল। মুখ ফুটে সেদিন কিছু বলেনি, বলেছিল পরে। তখন আমরা আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছি। কেন জানিনা, আজ আপনার পাশে বসে আমার সেই কথাই মনে পড়েছিল। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

আলোকিত রাজপথে স্মিতার আর ভয় করছিলনা। বলল: তার জন্যে এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন।

মনোহর অবিলম্বে স্মিতার মুখের দিকে তাকাল। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল: সত্যি বলছেন!

মিথ্যে কেন বলব!

মনোহর এতক্ষণ দূরে দূরে চলছিল। এবারে কাছে সরে এল। স্মিতা খুব সতর্কভাবে পা ফেলতে লাগল। এখন থেকে সতর্ক ভাবেই পা ফেলতে হবে।

মনোহর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল: আপনি বিলেত গেছেন?

আমি!

স্মিতা হেসে ফেলল। এমন অদ্ভুত প্রশ্ন কেউ তাকে করেনি। এ দেশের কটা মেয়ে বিলেত গেছে! তার মতো গৃহস্থ ঘরের মেয়ে!

মনোহর তার হাসি দেখেই বুঝল যে বিলেত যাওয়ার স্বপ্নও সে দেখেনা। বলল: এ একটা অভিজ্ঞতা। আমাদের প্রত্যেকের বিলেত যাওয়া উচিত। পুরুষ ও মেয়ে সবার সমান প্রয়োজন। বিলেতে না গেলে আমাদের চোখ ফোটেনা। এই ধরুননা, আমরা দুজনে পথ চলছি। কতক্ষণে পৌঁছব তার ঠিক নেই। বিলেত হলে

এই সময়ে দেশের এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত ঘুরে আসা যেত। তাতেও ওরা সন্তুষ্ট নয়। বলছে, এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাবে। ভাবছে, এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে যাবে। আর এ দেশে আমরা পায়ে হাঁটছি।

স্মিতা বলল: পাহাড় বলেই পায়ে হাঁটছি, প্লেনে হাঁটতে হতনা। এখানেও অনেক রাস্তায় মোটর চলছে।

মোটর!

মনোহর কী একটা কঠিন মন্তব্য করতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করে নিল। বলল: টিউবের কথা ভাবুন। মাটির তলায় একটা অদ্ভুত পৃথিবী! দূরকে দূর বলে আর মনে হবেনা। যে কোন জায়গা নিজের নাগালের মধ্যে।

স্মিতার মনে হল, মনোহরের পায়ে চলার অভ্যাস বোধহয় নেই। রাস্তা তো অল্প অল্প নেমেই গেছে, কোথাও বিশেষ চড়াই ভাঙতে হবেনা। ফেরার পথেও না। সিমলার লোক একে চড়াই বলে না। যারা বেড়াতে আসে, তারা হয়তো বলে।

এক সময় শহর শেষ করে তারা নির্জন রাস্তায় এসে পড়ল। বাড়ি ঘর নেই, দোকান পাটও না। বাঁ হাতে অন্ধকার পাহাড়, আর ডান হাতে এক একটা ঝাউ গাছ! পাহাড় নেমে গেছে তরঙ্গের মতো। সেই তরঙ্গের স্থানে স্থানে বিদ্যুতের মেলা। কার্ট রোডের উপর রেলের স্টেশন, ফাগ্‌লি, তুতিকান্দি। দিনের চেয়েও রাতে বেশি ভাল দেখায়। স্মিতা লক্ষ্য করল, মনোহর তার গা ঘেঁষে চলেছে। একটুখানি প্রশ্রয় পেলেই তার হাত ধরে চলবে। এই অন্ধকার নির্জন পথে স্মিতার সাহস হঠাৎ ফুরিয়ে গেল! মনোহরের কাছ থেকে খানিকটা তফাতে সরে গেল। একটু দূর দিয়ে চলাই ভাল।

মনোহরের দৃষ্টি বড় সজাগ। মনে মনে হাসল কিনা সেই জানে, গান ধরল গুণ গুণ করে:

ইওর আইজ আর দি আইজ অফ এ উওম্যান ইন লাভ।

স্মিতার হঠাৎ বিধায়কের কথা মনে পড়ল। এমন করে কত রাত্রে যে সে তার সঙ্গে বাড়ি ফিরেছে তার হিসেব নেই। হিসেব ওরা রাখেনি, রাখতে চায়নি। পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ ভাবে হেঁটেছে। গায়ে গা ঠেকেছে কিনা কোনদিন খেয়াল করেনি। ঠেকলেও যে চমকে ওঠেনি, তাতে সন্দেহ নেই। চমকে উঠলে আজ মনে পড়ত। বিধায়ক নিজে গাইতনা, তাকেই গাইতে বলত। মনোহর তাকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করলনা। নিজেই সে গানে মশগুল হয়ে আছে ঃ

ইওর আইজ আর দি আইজ অফ এ উওম্যান ইন লাভ।

স্মিতা ভাবল যে আজ তার ভাগ্য ভাল। কাল সন্ধ্যার মতো মদ গেলবার সুযোগ মনোহর পায়নি। পেলে সে তাকে ছাড়তনা, হাতখানা টেনে ধরত। হয়তো নাচতেও বলত। মনোহরের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল, দুপায়ে তাল ফেলে সে চলেছে। তার পেটে রঙীন জল পড়লে স্মিতাকেও আজ পায়ে তাল দিতে হত। তা হোক, মনোহরের সমাজটা স্মিতা কাছে থেকে দেখবে। তার জন্য একটু না হয় পায়ে তাল দিতেই হল। মনোহরের গলাটি মিষ্টি।

চোদ্দ

রবিবারের সকালবেলায় সনাতনের সাড়া পাওয়া গেল ছোট সিমলার রাস্তায়। বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে বড় রাস্তার উপরেই পল্টু ডাণ্ডাগুলি খেলছে। পাড়ার আরও দুএকটা ছেলে তার সঙ্গী। সবাই মিলে বেপরোয়া চেঁচাচ্ছে। সনাতনও চেঁচিয়ে উঠল: বাবাকে বলতে যাচ্ছি পল্টু!

মুখ ফিরিয়ে পল্টু দেখল সনাতন একা নয়, তার সঙ্গে আরও একজন ভদ্রলোক আছেন। বলল: ক্রিকেট খেলছে বলবেন।

এর নাম ক্রিকেট কবে থেকে হল?

পল্টু গম্ভীরভাবে বলল: দিশী ক্রিকেট। সেদিন মনোহরদা নাম দিয়ে গেছেন। বলেছেন, তাক ভাল হলে সত্যিকার ব্যাট আর বল কিনে দেবেন।

মনোহরের নামে সনাতন আশ্চর্য হল। কয়েকটা দিনেই সে চোপরা থেকে মনোহর হয়েছে। আর কিছুদিন গেলে না জানি কী হবে! কিন্তু সনাতন এই ভাবনার কথা প্রকাশ করলনা। পাশ দিয়ে যাবার সময় বলল: খেলবার জন্যে অ্যানান ডেল যেতে হবে। আর তা না হলে মনোহরদাকে ডজন কয়েক বল কিনে দিতে বল। একটা গড়িয়ে কালকায় পৌঁছলে আর একটা থাকবে।

মিস্টার সেন সঙ্গে ছিল। সমর সেন। হেসে বলল: আমরা কুড়িয়ে আনব।

পল্টু একটু এগিয়ে এসে সনাতনকে অনুরোধ করল: বাবাকে বলবেননা যেন!

কী বলবনা? মনোহরদার কথা, না ডাণ্ডাগুলির?

ছুটোই চেপে যাবেন।

সনাতন একটু হেসে বলল: কেন বলতো?

পল্টু একটু ভারিক্কি চালে বলল: সব কথা বাবার কানে তোলবার কী দরকার!

উত্তর শুনে সমরও হাসল।

হরিহরবাবুর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে সমর বলল: মায়াকে সঙ্গে আনলে ভাল হত।

না এনে কি কিছু ক্ষতি হয়েছে?

যদি রাজী না হন!

হবেন না।

সে কি!

সনাতন বলল: পুরুষ মানুষের নিমন্ত্রণ বলে রাজী হবেননা সে ভয় নেই। মনোহর চোপরার সঙ্গে স্যাণ্ডাল পয়েন্টে নাকি রোজই দেখা যাচ্ছে। কাজেই তাঁর রাজী হওয়া নির্ভর করছে খানিকটা মর্জির ওপর আর বাকিটা তার এনগেজমেন্টের ওপর। স্মিতা দেবী আজকাল—

কথাটা সনাতন শেষ করবার সুযোগ পেলনা। হরিহরবাবু তাঁর বারান্দায় বসে রোদ পোয়াচ্ছেন, আর স্মিতা তাঁর কাছে বসে উইমেন ওন্‌লির পাতা ওল্টাচ্ছে। সনাতন সমরের হাতখানা টেনে ধরে ফিসফিস করে বলল: যা বলবার, আপনিই বলবেন।

এ কথা বলবার দরকার ছিল। সনাতন জানে যে তাকে পছন্দ করে এমন লোক এ বাড়িতে নেই। সে কোন অনুরোধ করলে কেউ তা রাখবেনা, বরং বাধা দিলে জোর করে করবে। এ সবের জন্য অন্য কেউ যে দায়ী নয়, তা সে বোঝে। তাই সমরকে আগে ভাগেই সতর্ক করে দিল।

বারান্দায় জুতোর শব্দ পেয়ে হরিহরবাবু তাঁর উপনিষদের পাতা

থেকে মুখ তুলে চাইলেন। আশ্চর্য হলেন সনাতনের সঙ্গে একজন নূতন মানুষকে দেখে। স্মিতা উঠে দাঁড়িয়েছিল। নমস্কার বিনিময় করে খুব অন্তরঙ্গভাবে প্রশ্ন করল : মিসেস সেন এলেননা ?

তিনি রাঁধছেন।

স্মিতা তার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। হরিহরবাবু বললেন : আসুন আসুন।

ঘরে বসে সমর বলল : আজ একটা আবদার নিয়ে এসেছি।

বলে বাপ মেয়ে ছুজনের দিকেই তাকাল।

স্মিতা বলল : তাতে সঙ্কোচের কী আছে !

সমর উত্তর দিল : মায়া সঙ্গে থাকলে সঙ্কোচ করতুমনা। সে আসতে পারলনা বলেই আমাকে বলতে হচ্ছে। আজ আমরা তারাদেবী দর্শনে যাচ্ছি। মায়ার বড় ইচ্ছে, আপনি সঙ্গে যান।

বলে স্মিতার দিকে তাকাল।

তারাদেবী !

স্মিতা বিস্মিত হল। তারাদেবী কেউ বেড়াতে যায় ! অতখানি যাওয়া আসার মজুরি পোষাবে কেন !

সমর বলল : আপনি না গেলে আমরা খুবই ছুঃখিত হব।

হরিহরবাবু বললেন : কে কে যাচ্ছেন ?

সমর বলল : আমরাই ছুজনে। হাতে পায়ে ধরে সনাতনবাবুকে রাজী করিয়েছি। স্মিতা দেবী যদি যান তো আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়। মায়া আপনার জন্যও রাঁধছেন।

বলে আবার স্মিতার দিকে তাকাল।

হরিহরবাবু বললেন : মনোহর তো আপনার বিলেতের বন্ধু বলে শুনেছি। সে যাবেনা ?

তাকে বলিনি।

বলেন নি !

ঠাকুর দেবতার স্থান তার ভাল লাগবেনা। তাকে নিয়ে অন্যত্র যাব।

হরিহরবাবু মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। স্মিতা বলল: বিকেল বেলায় মনোহর আসবে। আজ—

সনাতন বাধা দিল। বলল: মিস্টার সেনও অনেকদিন বিলেতে ছিলেন। দিল্লীর সরকারী মহলে তাঁর খুব প্রতিপত্তি।

সমর লজ্জা পেল, বলল: এ সব কী বলছেন!

সনাতনের কথার মানে স্মিতা বুঝতে পেরেছে। বলল: কী বলছেন আমি জানি।

যেটুকু জানেননা, তাও বলি। মায়া দেবীও কিছু ঘুরেছেন। শুধু বেড়াতে নয়, লেখাপড়া শিখতে।

স্মিতা আশ্চর্য হয়ে বলল: তাই নাকি!

সনাতন বললনা যে মায়া এই দেশেই ঘুরেছে।

পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করেছিল। বাঁ হাতের তালুতে খানিকটা নস্যি ঢেলে বলল: সনাতন বাজে কথা বলেনা।

স্মিতা চিন্তিত হল। বিলেত ফেরৎ কোন মেয়ে সে আজও দেখেনি। তাদের আচার আচরণ ভাল করে জানা দরকার। সমাজে মিশতে তাহলে সুবিধা হবে। অন্তত মনোহরের সঙ্গে। অথচ ঠিক এই কথার পরেই রাজী হওয়া যায়না। সনাতন দু কথা শোনাবার সুযোগ পাবে। বলল: কখন ফিরবেন?

খুশী হয়ে সমর বলল: সন্ধ্যের আগেই ফিরব।

সশব্দে সনাতন তার নাক দুটো ভর্তি করে বলল: অনর্থক আর কথা বাড়াবেননা। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আসুন। মায়া দেবী খাবার নিয়ে আমাদের অপেক্ষা করছেন।

স্মিতা আর দেরি না করে উঠে পড়ল। হরিহরবাবু বললেন: আমি তো বাজারে যাচ্ছি। মনোহরকে খবরটা আমি জানিয়ে দেব।

মায়া সত্যিই খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছিল। স্মিতাকে দেখে খুশিতে উচ্ছল হল। বলল: আপনি যে আসবেন, তা আমি জানতাম। সনাতনবাবু যখন নিজে গেছেন—

মনে মনে সনাতন হাসল। এঁরা নূতন মানুষ। তাইতেই সনাতনের মহিমা জানেননা। কাজ পণ্ড করবার দরকার থাকলে যে সনাতনকে পাঠাতে হয়, সে কথা ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন। কিন্তু প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা তাদের ভাল হলনা। সনাতনের নিজের দরকারে স্মিতাকে ধরে এনেছে। একটা দিন তাকে সঙ্গে রাখা দরকার। টাকার যেমন দুটো দিক আছে, সমাজেরও তেমনি। স্মিতা আজ কদিন ধরে একটা দিক দেখছে। আজ সে আর একটা দিক দেখুক। দুদিক না দেখলে দেখা কখনও সম্পূর্ণ হয়না। জীবনের বন্ধুর পথে অন্ধের মতো পা ফেলতে হয়। সতর্ক হবার সুযোগ পাওয়া যায়না। সনাতন আজ স্মিতাকে সেই সুযোগ দিতে এনেছে।

সনাতনের জন্য যে স্মিতা আসেনি, সে কথা বলা অনাবশ্যক। সে অন্য কথা বলল: আপনি নাকি রাঁধছিলেন?

উত্তরে মায়া হাসল।

স্মিতা বলল: কেন, হোটেলের খাবার বুঝি আপনার পছন্দ হয়না?

মায়া বলল: পছন্দ হবেনা কেন, তবে নিজে রাঁধলে অনেক সুবিধা আছে।

স্মিতা তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তাই দেখে মায়া বলল: কোন্ জিনিস ওর ভাল লাগে, আমার সব জানা। নিজে বাজার করে রেঁধে খাওয়াতে আমারও ভাল লাগে। তারপরে—

মায়া সমরের দিকে তাকিয়েছিল। সমর হেসে বলল: সত্যি কথাটা বলেই ফেলনা যে পয়সা বাঁচে।

মায়া বলল: তাও তো মিথ্যে নয়। শুধু শুধু এক তোড়া টাকা জলে ফেলে লাভ কী। সেই টাকা হোটেলে না ঢেলে কোন জিনিস কিনলে সঙ্গে থাকে। সিমলার শাল—

চাল বললেনা?

সত্যি, এখানকার চাল বড় ভাল। যাবার সময় কিছু সঙ্গে নিয়ে যাব।

আর নুনও নিও।

তুমি ঠাট্টা করছ। কিন্তু এমন পরিষ্কার নুন দিল্লীতে পাইনে।

স্মিতা অবাক হয়ে এদের কথা শুনছে।

সমর বলল: খাবারের আর কত দেরি?

টাইমপিসে সময় দেখে মায়া বলল: আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা কর।

সমর উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলল: তোমাকে কী সাহায্য করি বলতো?

মায়া হাসল।

চেয়ার আনিয়েছ: ভিতর থেকে ঘুরে এসে বলল: প্লেটও আনিয়েছ দেখছি। সঙ্গে যে খাবার যাবে, তারও পুঁটুলি বাঁধা। চা-ও ভরে ফেলেছ বোধহয়!

মায়া হেসে বলল: তুমি স্থির হয়ে বস তো। এ সব মেয়েদের কাজে মাথা নাই বা গলালে।

কাজের দিনে তো গলাইনে, গলাই ছুটির দিনে। সিমলায় আমরা বেড়াতে এসেছি, তুমি একা কেন কাজ করবে?

মায়া সনাতনের শরণাপন্ন হল, বলল: কী বিপদেই পড়েছি দেখুন। কোথায় এক বুড়ো বুড়িকে দেখে এসেছে, তাদের বুড়ি রবিবার শুয়ে থাকে, আর বুড়ো সারাদিন তাকে রেঁধে বেড়ে খাওয়ায়। আমাকে ও এখন থেকেই বুড়ি ভাবছে।

সনাতন নিঃশব্দে হাসল।

স্মিতা বলল ঃ তারা দেবী আমরা কী করে যাচ্ছি ?

সমর সনাতনের দিকে তাকাল।

সনাতন বলল ঃ বেরবার আগে সে কথা নাই বা ভাবলুম। জীবনটা তো ছকে বাঁধা, একটুখানি মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যাবে।

মায়া বলল ঃ খুব ভাল বলেছেন। পাহাড়টা তো এইখান থেকেই দেখা যাচ্ছে, হাঁটতে হাঁটতেই পৌঁছে যাব।

সমর হেসে বলল ঃ তা যাবে বৈকি !

কেন, কয়েক মাইল তো পথ বললে। এটুকু হাঁটতে পারবনা ? লোকে কেদার বদরী কী করে যাচ্ছে !

সমর স্মিতার দিকে চেয়ে বলল ঃ আপনি নিশ্চয়ই অনেকবার গেছেন ?

অনেকবার ! ঃ স্মিতা বিস্মিত হল ঃ কী আছে সেখানে দেখবার !

চমৎকার মন্দির আছে শুনেছি। আর স্কাউটদের হেড কোয়ার্টার্স।

অমন মন্দির তো সব পাহাড়েই আছে।

কিন্তু তারাদেবী তো নেই !

ও নাম তো আপনার আমার মতো কোন মানুষের দেওয়া।

নিশ্চয়ই তাই। পৃথিবীর সমস্ত দেবতার সৃষ্টি তো মানুষই করেছে। মানুষের চেয়ে বড় কী আছে !

তবে আমরা কী দেখতে যাচ্ছি ?

কত বড় দেবতা, কেমন সুন্দর দেবতা, ঐ দেবতার দর্শনে প্রাণমন ভরে যায় কিনা !

মায়া বলল ঃ অমন সুন্দর পাহাড়ে উঠেও যদি তোমার প্রাণমন না ভরে, তো কোথাও গিয়ে ভরবেনা।

সমর হাসল।

সনাতন বলল ঃ মনে হচ্ছে আপনারা কেউই যাননি।

স্মিতা বলল ঃ কেন এমন মনে হচ্ছে ?

ইংরেজ কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ লিখে রেখে গেছেন তিনটি কবিতা—ইয়ারো আনভিজিটেড, ইয়ারো ভিজিটেড, ইয়ারো রিভিজিটেড।

মায়া হাসল।

সনাতন বুঝল যে মায়া এই কবিতা পড়েছে। বলল ঃ ইয়ারো একটা নদীর নাম। যে লোক আন্‌ভিজিটেড পড়বে, তাকে ইয়ারো দেখতে যেতেই হবে। ভিজিটেড পড়লে সে শখ আর হবেনা। রিভিজিটেড পড়লে যেতে ভয় হবে।

স্মিতা বলল ঃ তারাদেবীও কি ইয়ারো নাকি ?

মায়া বলল ঃ ভয় নেই, আমরা ভয় পাবনা।

সমর একবার রান্নাঘরটা ঘুরে এসে বলল ঃ বেশ গন্ধ বেরিয়েছে।

মায়া এ কথার উত্তর দিল না। সনাতনকে বলল ঃ তারাদেবী সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম। এই বিগ্রহ নাকি বল্লাল সেন প্রতিষ্ঠা করেন। কথাটা কি সত্যি ?

সমর বলল ঃ পাঞ্জাবে বল্লাল সেন আসবেন কোথা থেকে ?

সনাতন বলল ঃ প্রবাদ একটা আছে শুনেছি, কিন্তু প্রবাদটা ঠিক কী তা জানিনে।

কেউই কি বলতে পারবেন না ?

সমর বলল ঃ নিন এবারে, কোথায় কার কাছে গেলে এ সম্বন্ধে সব কিছু জানা যাবে, খুঁজে বার করুন।

সনাতন বলল ঃ আপনার বুঝি এ সব খুব ভাল লাগে ?

সমর বলল ঃ বলে দিই ?

ছি ছি, তুমি কেন কথা বলছ !

স্মিতা বলল ঃ আপনি লেখেন বুঝি ?

খাতায় লিখে রাখি, কাজ না থাকলে পাতা উল্টে দেখি।

সমর হাসছিল। তার হাসি দেখে মায়া যেন বিরক্ত হল, বলল ঃ

বেলা কত হল খেয়াল আছে? আর দেরি করলে পাহাড় থেকে আর নেমে আসতে হবে না।

স্মিতা কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, মায়া তাকে কথা বলবার সুযোগ দিলনা। নিজেই বলল: দুপুর রোদে পাহাড়ের চুড়োতেই বোধহয় পৌঁছতে পারবে না।

সনাতনের মুখের দিকে চোখ পড়তেই তার মনে হল, তারও কিছু প্রশ্ন আছে। মায়া আর অপেক্ষা না করে উঠে পড়ল। বলল: মাংস একটু কাঁচা থাকলে ফেলে দেবেন না।

সমর বলল: তাড়াতাড়ির দিনে মাংস চড়ালে কেন?

কী খাওয়াতাম তাহলে? মাছের দোকান এখনও বোধহয় খোলেনি, ভাতের সঙ্গে ডিম তুমি খেতে চাও না।

এত সকালে মাংস কোথায় পেলে?

ওমা, কাল ম্যানেজারবাবুকে বলে রাখিনি! তাদের কাছেই তো রাখা ছিল। তারা রোজ রাখে।

সমর আর বসে রইল না। উঠে গিয়ে জল গড়িয়ে আনল। প্লেট ধুতে যাচ্ছিল, মায়া বলল: আর ধুতে হবে না। ধুয়ে মুছে আমি ঢেকে রেখেছি।

রাখবার ধরনটিও অদ্ভুত। একখানার উপর আর একখানা উপুড় করা। সমর সন্তর্পনে এনে টেবিলে রাখল। ছোট চৌকো টেবিলে আজ চারখানা চেয়ার। পাশে আর একখানা টেবিল। মায়া তারই উপর কুকারের বাটি খুলবে। স্মিতার চোখের দিকে চেয়ে সনাতন এক টিপ নস্যি নিল। তার চোখ নাকের চেহারা দেখে মনে হল, সে ভেংচি কাটছে।

পনর

ড্রইং রুমে বসে চোপরা সাহেব ছেলেকে জ্ঞান দিচ্ছিলেন। পাশে বসে মিসেস চোপরা উল বুনছেন। তাঁর ধারনা, ছেলেরা সরল-মতি অনভিজ্ঞ হয়। উপযুক্ত উপদেশ পেলে তারা বড় হবার সুযোগ পায়। বড় না হোক, অন্তত নিজের মঙ্গল নিজে উপলব্ধি করে সাবধান হতে পারে। চোপরা সাহেব এ সবের সার্থকতা মানেন না। তাঁর অন্য রকম ধারনা। সে ধারনা নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ। ছেলেদের কাছে বাপেরা ওল্ড্ ফুল। বুদ্ধিমান ছেলেরা আড়ালে হাসে। তবু মিসেস চোপরাকে খুশী রাখা দরকার। সেই কারণেই সকাল বেলায় ছেলেকে জ্ঞান দিতে বসেছেন। বললেন ঃ কাপুরেরা লোক মন্দ নয়। কিন্তু বড় মৎলববাজ।

মনোহরের শরীরটা বোধহয় ম্যাজম্যাজ করছে। এ আলোচনায় খুব বেশি উৎসাহ পেল না। মিসেস চোপরা বললেন ঃ মৎলবের কী দেখলে ?

সবই তো দেখলাম।

মিসেস চোপরা হাত স্থির করে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন।

তুমিইতো বললে পূজোর ছুটিতে মেয়েকে ওরা আসতে লিখেছে।

তাতে মৎলবের কী আছে! বাপ মায়ের কাছে মেয়ে আসছে, আসবেই তো।

বুদ্ধিটা তোমার চিরকালই একটু ভোঁতা।

মিসেস চোপরা ছোটখাট মানুষ, কিন্তু বুদ্ধির খোঁটা সইতে রাজী নন। বললেন ঃ বুদ্ধির বড়াই অন্তত তুমি ক'রো না।

চোপরা সাহেব যুদ্ধটা এড়াবার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন: ভুলে যাচ্ছ কেন যে মনোহর এখন সিমলায় আছে।

তাতে হয়েছে কী?

ওদের মেয়েটাকে তো দেখেছ, বেহায়া মেয়ে। সুযোগ নেবার নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে। আমি কিছুতেই তা সমর্থন করব না।

কেন?

একটা ব্যবসাদারের মেয়ের সঙ্গে আমি আমার ছেলের বিয়ে দেব না। মনোহর তো ব্যবসা করবে না।

তবে কার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবে?

সে কথা দিল্লীতে গিয়ে ভাবব। আজ এইটুকু বলে রাখছি, যে মরদ দামাদকে টেনে না তুলতে পারবে, তেমন লোকের মেয়ে আমি ঘরে তুলব না।

মনোহর একটা হাই তুলল।

চোপরা সাহেব ছেলের দিকে চেয়ে বললেন: কাপুরদের সঙ্গে একটু সাবধানে মেলামেশা ক'রো।

মিসেস চোপরা বললেন: একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ।

আমি কোন কথা ভুলি না।

ও তোমার অহংকার। ঐ অহংকারের জন্যেই তোমাকে মাঝ পথে পড়ে থাকতে হল।

চোপরা সাহেবের এটি দুর্বল স্থান। তাঁর বন্ধু বান্ধবদের ভিতর দু একজন সম্মানের শীর্ষে উঠেছেন। চোপরা সাহের তাঁদের নাগাল পান না। আমলও পান না তাঁদের কাছে। কিন্তু তর্কে হার স্বীকার করতে রাজী নন। বললেন: সে সম্মানের জন্য। শুধু আত্মসম্মান নয়, পরিবারের সম্মানও আছে। তুমি অন্য কথা বল।

মিসেস চোপরা বললেন: কাপুরদের পয়সা আছে, রাজত্ব আজকাল তাদেরই।

মনোহর হঠাৎ প্রশ্ন করল ঃ অনেক পয়সা ?

গদগদ ভাবে মিসেস চোপরা বললেন ঃ আমাদের এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারেন অনায়াসে। আমাদের কেন, মন্ত্রীদের কেনা বেচা করেন। দেখলেনা কাল !

বল কি !

ঠিকই বলছি বাছা। সেদিন একজন বলছিল যে এরাই নাকি মন্ত্রী নির্বাচন করে। তার আগে শর্ত করিয়ে নেয়, এই সুবিধেটি করে দিতে হবে। না দিলে নামিয়ে দেবে। সরকার তো আজকাল এরাই চালাচ্ছে।

চোপরা সাহেব প্রতিবাদ করলেন ঃ কাপুরের সে মুরোদ নেই।

তোমাকে বলবে কিনা !

পঁয়ত্রিশ বছর চাকরি করছি, ওদের আমার চেনা আছে।

চোখ বন্ধ করে দেখেছ।

কেমন ?

সেদিন কী দেখলে ? মন্ত্রীর সামনে তুমি তো জুজু হয়ে রইলে, আর কাপুর কী করল ?

আমতা আমতা করে চোপরা সাহেব বললেন ঃ ওরা বন্ধু, ওদের কথাই আলাদা।

খুশী হয়ে মিসেস চোপরা বললেন ঃ খোঁজ নিয়ে দেখ, অমন বন্ধুতা ওদের সব মন্ত্রীর সঙ্গেই আছে।

মনোহর আবার হাই তুলল। ড্রইং রূমে বসে সময় নষ্ট করতে তার ভাল লাগে না। জীবনে তার নূতন সূর্যোদয় হয়েছে, এখন তার জীবনকে উপভোগ করার দিন। সূর্যাস্তের পর এসে ড্রইং রূমে বসবে। ছেলের অধীরতা লক্ষ্য করে মিস্টার চোপরা বললেন ঃ যে কথা বলব বলে তোমাকে ডেকে বসিয়েছি, তা এমন গোলমেলে নয়। বিবাহ জিনিষটা খুবই সরল ব্যাপার, কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করা। তুমি যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পার। কিন্তু—

চোপরা সাহেব এক মুহূর্ত থামলেন, স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেনঃ একবার বিয়ে করে ফেললে স্ত্রী বদল করা বেশ একটু ঝামেলার ব্যাপার। সেইজন্যেই বলি যে ওই কাজটি যথেষ্ট ভেবেচিন্তে করা দরকার। পরে যাতে পস্তাতে না হয়।

মনোহর মেনে নিয়ে বলল ঃ সে খুব ঠিক কথা। কিন্তু—

এর ভিতর তো কিন্তু নেই।

আছে বৈকি।

আলবৎ নেই।

আমি তোমার প্রতিবাদ করছি না, আমি বলছি—

চোপরা সাহেব বাধা দিতে যাচ্ছিলেন, মিসেস চোপরা বললেনঃ বল।

মনোহর এবারে কথাটা শেষ করবার সুযোগ পেল। বলল ঃ আমি বলছি, আজ এ সব আলোচনা কেন?

চোপরা সাহেব নিশ্চিন্ত হয়ে বললেনঃ তাই বল।

তারপর নিজেই উত্তর দিলেনঃ আলোচনাটা আগেই করতে হয়। দুর্ঘটনার পরে করে কোন লাভ নেই।

দুর্ঘটনার তুমি কি কোন আভাষ পেয়েছ?

হঠাৎ ঘটে বলেই তা দুর্ঘটনা। যারা বিচক্ষণ তারা আগেই সাবধান হয়।

বাইরে কার পদধ্বনি শোনা গেল। উৎকর্ণ হলেন সবাই। কিন্তু মনোহর লাফিয়ে বেরল। হরিহরবাবু গেট খুলে ঢুকছিলেন। মুহূর্তে মনোহরের সমস্ত আলস্য অন্তর্হিত হল। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। বলল ঃ কী সৌভাগ্য আমার, আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।

হরিহরবাবু বললেনঃ বাজার করতে বেরিয়েছি। ভাবলুম খবরটা তোমাকে দিয়ে যাই।

খবর ?

হ্যাঁ। স্মিতা আজ তারাদেবী বেড়াতে গেল। বিকেলবেলায় ফিরতে হয়তো দেরি হবে।

স্মিতা বেড়াতে গেল!

বড় বিমর্ষ দেখাল মনোহরকে।

স্বেচ্ছায় যায়নি, কে এক সেন এসেছিল সনাতনকে সঙ্গে নিয়ে। সনাতনের মুখ জান তো, একেবারে ভাগাড়। দু দণ্ডও সহ্য করা কঠিন। স্মিতা তারই ভয়ে বেরিয়ে গেল।

সনাতন বসু ?

সনাতনকে তুমি দেখেছ। তোমাদের পার্টিতে এসেছিল স্মিতাকে নিয়ে।

চিনেছি চিনেছি।

বলে হরিহরবাবুকে আপ্যায়িত করে মনোহর ঘরে আনল। চোপরা দম্পতি তাঁকে চেনেন। কাজেই মনোহর পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই চোপরা সাহেব বাধা দিলেন, বললেনঃ ব্যানার্জি কেমন আছ ?

হরিহরবাবুর শোক উথলে উঠল, বললেনঃ বুড়ো বয়সে আর ভাল থাকা। এটা সেটা তো লেগেই আছে।

চোপরা সাহেবকে বড় গম্ভীর দেখাচ্ছিল। অকস্মাৎ বলেই ফেললেনঃ ব্যানার্জির সঙ্গে তোমার কোথায় পরিচয় হল ?

কেন, ওঁদের বাড়িতেই পরিচয় হয়েছে।

চোপরা সাহেব আর প্রশ্ন করলেন না। বুঝতে বোধহয় সবই পারলেন। স্মিতাকে তো তিনিই ডেকে এনেছিলেন, এসব প্রশ্ন এখন অবান্তর। মিসেস চোপরাও কিছু বুঝতে পেরেছেন, কিছু পারেন নি। কিন্তু কোন প্রশ্ন করা যে শোভন হবে না, তা বুঝতে পেরেছেন।

গদগদ ভাবে হরিহরবাবু বললেনঃ মনোহর বড় ভাল ছেলে।

ছেলের প্রশংসা শুনে চোপরা সাহেব খুশী হতে পারলেন না। বরং কিছু রুষ্ট হলেন। হরিহরবাবু এমন কোন মানুষ নন যার প্রশংসার দাম আছে। আর ভাব দেখে একটু ঘনিষ্ঠতার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। তা না হলে চোপরা সাহেবের উপযুক্ত ছেলেকে নাম ধরে ডাকবার দুঃসাহস তিনি কোথায় পাবেন।

চোপরা সাহেব মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

মনোহর জিজ্ঞাসা করলঃ সনাতন বুঝি স্মিতার বয় ফ্রেণ্ড?

হরিহরবাবু কী বুঝলেন তিনিই জানেন। বললেনঃ ফ্রেণ্ড! ও তার শত্রু। সনাতন সকলের শত্রু। শুধু সমাজের নয়, পৃথিবীরও শত্রু।

চোপরা সাহেব বললেনঃ গোসোয়ামির কথা বলছ তো, কালী-বাড়িতে যে পাকাপাকা কথা কইছিল!

ঠিক ধরেছেন। ঐ সব ছেলেদের গুলি করে মারা উচিত।

তবে মেয়েকে কেন সঙ্গে যেতে দিলে?

ভয়ে। বাধা দিলে আমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করত।

মনোহর বললঃ ও যদি স্মিতাকে বিয়ে করতে চায়?

অ্যাঁ?

হরিহরবাবু আঁৎকে উঠলেন। চোখের সামনে বুঝি ভূত দেখতে পাচ্ছেন।

মনে করুন, তারাদেবী থেকে ফিরে এসে তিনি বিয়ের প্রস্তাব করছেন। আপনি কী করবেন?

হাসতে হাসতে হরিহরবাবু বললেনঃ অত বড় ধৃষ্টতা তার হবে না।

আমি যদির কথা বলছি।

হরিহরবাবু চট করে কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তারপরে হঠাৎ বলে উঠলেনঃ আমার মেয়েই তাকে জবাব দিতে পারবে।

আর মেয়ে যদি রাজী হয়?

না না, সে কিছুতেই রাজী হবেনা, রাজী হতে পারেনা।

ধরে নিন সে রাজী হল।

উত্তেজিত ভাবে হরিহরবাবু বললেন: এমন কথা আমি ধরে নিতে পারি না।

চোপরা সাহেব বললেন: দুনিয়ায় আজকাল সবই সম্ভব ব্যানার্জি।

মানুষের ঘৃণা বলেও তো একটা কথা আছে। স্মিতা যাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে, তাকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না।

মনোহর বলল: এই তো এক সঙ্গে বেড়াতে গেল। এমনি করেই একদিন হাত ধরে আপনার সামনে আসতে পারে!

বিধায়ক কি ভেসে যাবে?

বিধায়ক কে?

আমি চ্যাটার্জির কথা বলছি। ভাল ছেলে। তারই সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেব ভেবেছি।

ও স্প্লেনডিড! চ্যাটার্জি চমৎকার ছেলে। আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, অমন ছেলে সিমলাতে নেই।

চোপরা সাহেব একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁপাতে লাগলেন। আর মনোহর কী করবে ভাবতে লাগল।

হরিহরবাবু বললেন: সনাতনের একটা গুণ আমি স্বীকার করি। এই বিয়েতে ওর সমর্থন আছে, আর বিয়েটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার চেষ্টাও করছে।

খুশী হয়ে চোপরা সাহেব বললেন: সত্যি! কাল গোসোয়ামিকে আমি চা খেতে ডাকব।

সনাতনকে!

হরিহরবাবু প্রচুর আশ্চর্য হলেন।

চোপরা সাহেব বললেনঃ আশ্চর্য হচ্ছ কেন! গোসোয়ামি পরোপকারি তা তো আমার জানা ছিল না। তাকে তার প্রাপ্য সম্মান আমি দেবই। তাকে একটা খবর দিতে পারবে ব্যানার্জি?

এইবারে হরিহরবাবু ঝিমিয়ে পড়লেন, বললেনঃ তাকে! সে কী চীজ, তা তো জানেন?

জানি বলেই নিমন্ত্রণ করছি।

কিন্তু এ ভারটা আমার ওপর দেবেন না, অনর্থক আমি কেন গালমন্দ শুনি!

চোপরা সাহেব সোজা হয়ে বসলেন। আমি নিমন্ত্রণ করেছি শুনলে সে গালমন্দ করবে?

ভগবানকেই ও গালমন্দ করে, তায় মানুষ। দোহাই আপনার, ওকে কিছু বলতে বলবেন না।

হরিহরবাবু তাঁর বাজারের থলিটি হাতে করে উঠে দাঁড়ালেন। মনোহরও উঠল এবং কথা না বলে তাঁকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গেল।

ষোল

হরিহরবাবুকে এগিয়ে দিতে গিয়ে মনোহর আর ফিরল না। তাঁর সঙ্গে পা ফেলে চলতে লাগল। কাঁকরের পথ শেষ হয়ে বাঁধানো রাস্তা। সেই রাস্তা লক্কড় বাজারে পৌঁছেছে। হরিহরবাবু আরও একবার দাঁড়িয়ে বললেন: আর নয়, অনেকদূর এগিয়ে এসেছ বাবা, এই বারে ফের।

মনোহর বলল: আপনি এমন সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন! সামান্য একটা খবর দেবার জন্যে আপনি কতদূর এসেছেন, আমি না হয় একটু এগিয়েই দিলাম।

অনেক দূর তো এগিয়ে দিয়েছ।

আপনাকে তো আমার পৌঁছে দেওয়া দরকার।

বল কী, এখন যে আমি বাজার করব।

চলুন না, আমি আপনাকে বাজারে পৌঁছে দিই।

পাহাড়ের এ দিকটায় তখনও রোদ আসেনি, কিন্তু মলের উপর রোদ ঝলমল করছে। খানিকটা প্রখরও হয়েছে। উত্তরে তুষারশৃঙ্গের উপরও আলো পড়েছে। সামনের ঐ পাহাড়টা না থাকলে অদ্ভুত সুন্দর দেখাত। কিন্তু মনোহরকে আজ এ সমস্ত দৃশ্য আকর্ষণ করল না। তার চিন্তা আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। আজ সে একটা নূতন নাম জেনেছে। বিধায়ক চ্যাটার্জি। সিমলাতে যে এমন ছেলে নেই, তার বাবাও সে কথা স্বীকার করলেন। তবে কি এই লোকটির জন্যই স্মিতা তার কাছে ধরা দিতে চাইছে না! আর তারই কাছ থেকে পালিয়ে যাবার জন্যেই তারাদেবী চলে গেল? ইচ্ছে হল এই সব কথা সে হরিহরবাবুর

কাছে জেনে নেয়। ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল : বিধায়কবাবুও নিশ্চয়ই তারাদেবী গেছেন ?

বোধহয় না।

কেন ?

সেনদের সঙ্গে তো সে পরিচিত নয়। কাজেই না যাওয়াই সম্ভব।

তিনি কি আজ বাড়িতে বসে আছেন ?

হরিহরবাবুর হঠাৎ মনে হল যে বিধায়কের নাম শুনে অবধি মনোহরের মুখ বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছে। তাইতো, বিধায়কের প্রসঙ্গটা তো অবান্তর হয়েছে। বরং ক্ষতিই হয়েছে তাতে। সনাতনের নামে ক্ষেপে গিয়েই তিনি এই বেহিসেবী কাজ করে ফেলেছেন। এইবারে অত্যন্ত তৎপর ভাবে তাঁর ভুল সংশোধনের চেষ্টা করলেন, বললেন : বিধায়কের কথা ব'লো না। এতটুকু ব্যক্তিত্ব নেই। স্মিতার সঙ্গে এতদিনের জানাশোনা। তবু মেয়েটা বিয়েতে রাজী হচ্ছে না।

কেন ?

ঐ তো বললাম, ব্যক্তিত্বের অভাব। আজকালকার মেয়েরা যে সব গুণ চায় তার একটাও নেই। অমন ভাল মানুষকে দিয়ে আর যাই হোক, সংসার হয় না।

বিধায়কের বাড়ি কোথায় ?

সর্বনাশ, তুমি যাবে নাকি তার বাড়ি ?

না, আমি এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম।

তাও ভাল। সে অনেক নিচে থাকে, ফাগ্‌লিতে।

ফাগ্‌লিতে !

মনোহর মনে করবার চেষ্টা করল, জায়গাটা সে চেনে কিনা।

হরিহরবাবু বললেন : স্টেশনের নিচে যে পল্লীটা দেখা যায়, সেইটেই হল ফাগ্‌লি।

মনোহরের বোধহয় মনে পড়ে গেল। বিলেত যাবার আগেও সে সিমলাতে অনেক সময় কাটিয়েছে। বলল ঃ বুঝেছি।

মল থেকে নেমে হরিহরবাবু বাজারে যাবেন। মনোহর দাঁড়িয়ে বলল ঃ এইবারে আমি ছুটি নিই।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, তুমি অনর্থক আমায় অনেক দূর এগিয়ে দিলে।

হরিহরবাবু এগিয়ে গেলেন, কিন্তু মনোহর ফিরল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সিমলার জনতাকে। মলের উপরে অনেক ছেলেমেয়ে জড়ো হয়েছে। অনেকে উঁচু কাঠের বেঞ্চির উপর বসে রোদ পোয়াচ্ছে, অনেকে লোহার রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের নিচে নিচু বেঞ্চির উপরেও অনেকে অলস ভাবে বসে আছেন। রবিবারের রোদ বুঝি অন্য দিনের চেয়ে বেশি মিষ্টি।

মনোহরের হঠাৎ মনে হল, এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে তার চলবে না। পৃথিবীটা তো থেমে পড়েনি, থেমে পড়বেও না। তবে কেন সে এমন দাঁড়িয়ে থাকবে! এ যুগের আদর্শ এ নয়। নিজের প্রাপ্য গণ্ডা নিজেকেই বুঝে নিতে হবে। কেড়ে না নিলে হাত বাড়িয়ে কেউ কিছু দেবে না। মনোহর ভাবল, তাকেও তার দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

কখন যে সে চলতে শুরু করেছিল তা খেয়াল করেনি। যখন খেয়াল হল, দেখল স্টেশনের দিকে নেমে চলেছে। সে কি বিধায়কের বাড়ি যাচ্ছে! সেখানে গিয়ে সে কী করবে? বিধায়কের সঙ্গে ভাব করতে নিশ্চয়ই যাচ্ছে না। যাচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। দীর্ঘ দিন ধরে বিধায়ক যে দাবীকে তিলে তিলে ঘোষণা করেছে, মনোহর তার শক্তি দেখতে চায়। এক আঘাতে তাকে কাবু করা চলবে কিনা জানতে চায়।

সনাতনের কথাও তার মনে পড়ল। তাকে সে চিনতে পারেনি।

বুঝতেও পারেনি ভাল করে। তারও শক্তি জেনে রাখা দরকার। তার অভিসন্ধিটাও। লোকটা যে বুদ্ধিমান তাতে সন্দেহ নেই। নিজে আড়ালে থেকে খেলছে, খেলাচ্ছে। কোন গভীর অভিসন্ধি যে আছে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বিধায়ক হয়তো কিছু জানে, হয়তো কিছু জানা যাবে। বিধায়ককেও জানা দরকার।

মনোহরের হঠাৎ মনে হল, সে বুঝি পাগলামি করছে। কোন নারীর জন্য এমন কাজ তো সে কখনও করেনি। বিদেশে নারী এসেছে তার কাছে, ধরা দিয়েছে। তাদের নিয়ে সে যথেচ্ছ খেলা করেছে। নারীকে সে বিলাসের সামগ্রী ছাড়া অন্য রূপে কোন দিন দেখেনি। কই, তাদের কারও জন্য তো সে চঞ্চল হয়নি, ছুটে যায়নি কারও কাছে! কারও জন্য তাকে প্রতীক্ষা করতে হয়নি। মনোহর ভাল করে ভেবে দেখল। না, কোন ব্যতিক্রমের কথা তার মনে পড়ছে না।

হঠাৎ এই পরিবর্তন তার কেন এল? এ কি প্রেম, না মোহ? প্রেমের নামে যে মনোহরের এতদিন হাসি পেত। তবে নিশ্চয়ই মোহ! মোহ তো দুর্বলতার নামান্তর। এ দুর্বলতা তার কেন এল!

মনোহর যে কখন ফাগলিতে পৌঁছে গেছে খেয়াল করেনি। এই বারে তাকে বিধায়কের বাড়ি খুঁজে বার করতে হবে। হরিহরবাবু যে নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। কিন্তু তারপরে কী করবে! কী বলবে বিধায়ককে! গল্প করতে এসেছি! সে বিশ্বাস করবে না। স্মিতার সম্বন্ধে খবর নিতে এসেছি! তা বলা যায় না। মেয়েদের সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করা যে অসৌজন্য। তবে—

এই তো, এইখান থেকে বাঁ হাতে দু খানা বাড়ি। ছোট কাঠের গেটে নামের প্লেট ঝুলছে—বি. চ্যাটার্জি! মনোহরের হঠাৎ মনে হল, নামতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। শরীরটা ঘেমে উঠেছে, গরম হয়েছে

কান দুটো। কিন্তু বিলেতে তো কখনও এমন হয়নি! এর চেয়ে কত অভাবনীয় অবস্থায় সে কত বার পড়েছে। কই কখনও তো সে এমন অসহায় ভাবেনি! আজ সে কেন এমন দুর্বল হয়ে গেল!

একখানা, দুখানা। এই তো দ্বিতীয় বাড়ি, এই কাঠের গেট। নামের প্লেটও আছে। মানুষটি আছে কি? সামনের দরজা কি বন্ধ আছে? তাইতো। বিধায়ক বোধহয় বাড়ি নেই। মনোহর তবু এগিয়ে গেল। কাঠের বারান্দা। গলাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে সে বারান্দায় উঠল। কাঠের উপর তার জুতোর শব্দ উঠল খটখট করে।

মনোহর ভাবছিল, কী বলে ডাকবে। এই ছোট্ট বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে বেয়ারাকে ডাকবে, না বাড়ির মালিককে। মালিককেই বোধহয় ডাকা উচিত। কলিং বেল নেই? এ দেশে কেন যে সকলের প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র থাকে না! মানুষগুলোরও প্রয়োজন বোধ বড় কম। তারপরেই সে উৎকর্ণ হল। মনে হল, ভিতরে কার পদধ্বনি শোনা গেছে।

মনোহরকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল না। বিধায়ক এসে দরজা খুলে দিল। নমস্কার বিনিময় হল। মনোহর বলল: আমার নাম মনোহর চোপরা।

বিধায়ক বলল: আমি বিধায়ক চ্যাটার্জি। ভিতরে আসুন।

ঘর ছোট। তার ভিতর অন্ধকার বড় ঘন হয়ে আছে। বিধায়ক বাতি জ্বালল না। একখানা বেতের চেয়ার হাতে করে পূবের বারান্দায় বেরল। সেখানে একখানা টেবিল আর চেয়ার ছিল আগে থেকেই। বোঝা গেল যে বিধায়ক এই বারান্দায় বসে রোদ পোহাচ্ছিল। সঙ্কীর্ণ বারান্দা। কোনরকমে ওধারের চেয়ারের কাছে পৌঁছে বিধায়ক বলল: বসুন।

মনোহর ভাবছিল, এখানে তার আসার কারণটা এইবারে বলা দরকার। বসেই বলল: স্মিতার খোঁজ করতে এলাম।

স্মিতা তো এ বাড়িতে থাকে না।

না না, সে কথা জানি। তার বাবা বলল্লেন, সে আপনার কাছে এসেছে।

আমার কাছে!

বিধায়ক যেন আকাশ থেকে পড়ল।

মনোহর মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছেঃ শুনলাম, সনাতনবাবুর সঙ্গে সকালবেলাতেই আপনার কাছে চলে এসেছেন।

বিধায়কের বিস্ময়ের যেন শেষ নেই। আর মনোহর উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বিধায়ককে সে চিনে ফেলেছে। বিধায়ক এখন তার হাতের মুঠোর মধ্যে। এই ভালমানুষটাকে দিয়ে সে যা খুশী তাই করাতে পারবে। বলল ঃ তাঁরা তো প্রায়ই আপনার কাছে আসেন।

বিধায়ক ভুলে গেল যে সে নিজেই স্মিতার কাছে প্রায় রোজই যায়। ছুটির দিনগুলো কাটায় তারই সঙ্গে। সে ভাবতে লাগল মনোহরের উত্তর। কই, সনাতন তো স্মিতাকে নিয়ে কখনও আসেনি। স্মিতা কি সনাতনের সঙ্গেও বেড়াতে বার হয়! বিধায়ক কোন উত্তর দিতে পারল না।

মনোহর বলল ঃ থাক সে কথা। স্মিতা যখন নেই, তখন আপনার সঙ্গেই একটু গল্প করে ফিরি।

বিধায়ক কতকটা সামলে নিয়েছে। বলল ঃ একটু চা খান।

মনোহর বলল ঃ অন্য দিন খাব। আজ শুধু গল্প।

মনোহর লক্ষ্য করল যে বিধায়কের পায়ের কাছে প্রচুর কাগজের টুকরো। বিধায়ক কিছু লিখেছিল, আর তা ছিঁড়ে ছিঁড়ে পায়ের কাছে ফেলেছে। টেবিলের উপরে যে কাগজ, তাতে কবিতার মতো কয়েক ছত্র লেখা। মনোহর হেসে বলল ঃ আপনি বুঝি কবিতা লেখেন?

না।

মনোহরের মুখের দিকে তাকিয়ে বিধায়ক বুঝতে পারল যে এ কথা তার বিশ্বাস হয়নি। অমন টুকরো টুকরো লাইন ভেঙে ভেঙে কেউ অফিসের নোট লেখে না, চিঠিও না। তাই একই নিশ্বাসে যোগ করল: একটা গান রচনার চেষ্টা করছি।

হাউ ওয়াণ্ডারফুল!

বিধায়ক লজ্জিত বোধ করল, বলল: আপনি আমাকে কবি ভাববেন না। আমি কোনদিন কিছু লিখিনি। আমার প্রথম চেষ্টা তো দেখতেই পাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়তো হবে না।

তবু আপনার ইচ্ছা তো হয়েছে! আমি এমন দুঃসাহসের কথা ভাবতেই সাহস পাই না।

একটা কথা বোধহয় আপনি জানেন না।

কী?

স্মিতা নিজের লেখা গান গায়।

বলেন কি!

সেদিন আপনার পার্টিতে যে গান গাইল, সে নিশ্চয়ই তার নিজের লেখা গান।

গান! স্মিতা তো কোন গান গায়নি!

গায়নি! কিন্তু তাকে তো গান গাইবার জন্যই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

মনোহরের হঠাৎ অনেক কথা মনে পড়ে গেল। মন্ত্রীর কথা, কাপুর ও সেনদের কথা, সনাতন ও স্মিতার কথা। সনাতন ও স্মিতাকে সে স্বামী-স্ত্রী ভাবতে পারত। মিস্টার গোস্বামী ও মিস ব্যানার্জি নাম শুনে সে ভুল করবার অবকাশ পায়নি। আজ সে ভুল করছে কিনা বুঝতে পারছে না। স্মিতার বাবা যা বললেন, তার সঙ্গে বাস্তবের মিল যেন কিছু কম। সনাতনকে স্মিতা দু চক্ষে দেখতে পারে না, কিন্তু তারই সঙ্গে তারাদেবী গেল বেড়াতে। হরিহরবাবু

বললেন, ভয়ে। মানুষ মানুষকে এমন ভয় পায়! মানুষ কি বাঘ, না ভালুক!

মনোহর দেখছে যে বিধায়ক একা বসে স্মিতার জন্য গান লিখছে। স্মিতা যদি এই গান গায়, বিধায়ক নিশ্চয়ই নিজেকে ধন্য মনে করবে। হরিহরবাবু বললেন, এই বিধায়কের সঙ্গে স্মিতার বিয়ে হবে। কিন্তু স্মিতা তার কাছে এল না। সে গেল সনাতনের সঙ্গে বেড়াতে। বিধায়ক এই সংবাদ পেয়ে বিচলিত হয়েছে। এমনি করে স্মিতা একদিন যাবে, দু দিন যাবে, তারপর তার ধারনাই হয়তো বদলাবে। মানুষের বাইরের রূপটা তো তার সত্য রূপ নয়। তার ভিতরে যে রূপ প্রচ্ছন্ন আছে, সেইটাই আসল রূপ। প্রথম দর্শনে মানুষ বাইরের রূপ দেখেই মুগ্ধ হয়, ভালবেসে কাছে টেনে নেয়, কিংবা ঘৃণা করে দূরে ঠেলে দেয়। তারপর অলস অবসরে পরিচয় যখন নিবিড় হয়, তখনই ধরা দেয় ভিতরের রূপ। যাকে এতদিন ভালবেসেছিল, তাকে হয়তো ঘৃণা করে। আর যাকে ঘৃণা করেছিল, তাকে ভালবাসার জন্য উন্মুখ হয়। মানুষ বড় আশ্চর্য জিনিষ। মানুষের মধ্যে জগতের সমস্ত বিস্ময় আছে লুকিয়ে।

মনোহরের উত্তর না পেয়ে বিধায়ক বলল: আপনি জানেন না তাহলে। মিস্টার চোপরা কালীবাড়িতে এসে সনাতন আর স্মিতাকে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিলেন। সনাতন ভাল তবলা বাজায়।

মনোহরের বুঝতে বাকি রইল না যে এইজন্য তারা পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে বলল: তবে তো তাদের আমি ছেড়ে দেব না, জোর করে গান শুনব। সনাতনবাবুকে ধরলেই বোধ হয় স্মিতা রাজী হবেন?

বিধায়ক মনোহরের দিকে তাকাল। এই নূতন লোকটা কি সত্যই সনাতনকে এমন মুরুব্বি ভাবছে! কিন্তু কেন ভাবছে! স্মিতা নিজেই কি এমনি ভাববার সুযোগ দিয়েছে, না সনাতন

এই কথা প্রচার করছে! দিন কয়েক থেকে সনাতনকে যেন অন্য রকম মনে হচ্ছে। স্মিতার উপর যেন একটু বেশি দৃষ্টি, একটু বেশি ভাবনা। লোকটা কি বদলে গেল!

বিধায়কের চোখের দিকে তাকিয়ে মনোহর ভারী খুশী হল। তামাকের পাউচ আর পাইপ বার করল পকেট থেকে। বাম হাতের তেলোয় যখন সে তামাক নিচ্ছিল, তখন বিধায়ক দেখল যে সে ডান পায়ে মাটিতে তাল দিচ্ছে। কাঠের বারান্দার উপর মৃদু শব্দ উঠছে খুট খুট করে।

সতেরো

হরিহরবাবু তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ছেলেটাকে কেমন দেখছ?

কোন্ ছেলেটা?

আমি তোমাদের মনোহরের কথা বলছি।

মনোহর মন্দ কি ভাল, তাতে আমাদের কী এসে যায়!

হরিহরবাবু এ কথার উত্তর চট করে দিলেন না। প্রতিদিনের মতো তাঁর বারান্দার অন্য এক ধারে এক ফালি রোদ এসে পড়েছে। হরিহরবাবু বিকেলের সেই রোদে পিঠ দিয়ে বসেছেন। পৃষ্ঠতঃ সেবয়েদর্কম্। গায়ে তাঁর গরম তুস, চোখে চশমা। ডান হাতখানা একটুখানি বার করে কেনোপনিষদে মন দেবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কিছুতেই মন লাগছিল না। সকাল সকাল বাজার করে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। গৃহিনী রাতের একটা রান্না চড়িয়ে দিয়ে বাইরে এসেছিলেন স্বামীকে দেখতে। সেই সময় এই আলাপ।

স্বামী উত্তর দিলেন না দেখে স্ত্রী বললেনঃ বসে বসে মনোহরের কথা কেন ভাবছ?

সে কথা বুঝলে আমার সুবিধে হত।

তুমি কি—

কথাটা তিনি সম্পূর্ণ করবার সাহস পেলেন না। কিন্তু হরিহরবাবু থামতে দিলেন না, বললেনঃ বল না, কী ভাবছ।

তুমি কি মেয়ের সঙ্গে—

ঠিক বলেছ, মেয়ের বিয়ের কথাই ভাবছি।

সরোজিনী বসে পড়লেন।

হরিহরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন : কী হল ?

ভয়ে ভয়ে সরোজিনী বললেন : হঠাৎ এমন দুঃসাহস কেন হল ?

দুঃসাহস কিসের ?

এ যে বামন হয়ে চাঁদে হাত।

হরিহরবাবু হাসলেন, বললেন : চাঁদ যে নিজেই নেমে এসেছে।

কিন্তু—

কিন্তু আবার কিসের ?

আমরা বাঙালী, কুলিন ব্রাহ্মণ—

রাখো তোমার জাত-ধর্ম। সারা জীবনটাই তো বেজাতের গোলামি করে কাটল। এবারে এই মেয়ের বিয়ে দিয়ে যদি জাতে উঠতে পারি তো ক্ষতি কী!

হরিহরবাবুর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কেনোপনিষদখানা মুড়ে তিনি টেবিলের উপর ফেলে দিলেন।

সরোজিনী অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা কইতে পারলেন না। স্বামীর মুখে যে এমন অসম্ভব কথা শুনতে হবে এ তাঁর ধারনার অতীত। যে মানুষ সারা জীবন ধরে উপনিষদ পড়ল, তার চোখেও এত সহজে ধাঁধা লাগে! কী বিচিত্র জগৎ! পৃথিবীটা বড় তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে।

হরিহরবাবু বললেন : বড় আঘাত পেলে মনে হচ্ছে! আঘাত, না আনন্দ ?

কিন্তু সরোজিনী এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় পেলেন না। ভিতর থেকে পন্টুর চিৎকার শোনা গেল : মা, তরকারি পুড়ছে।

নিমেষে সরোজিনী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

একটুখানি অসাবধান হলে তরকারি পোড়ে। হরিহরবাবু ভাবলেন, জীবনও বুঝি পোড়ে। কত লোকেরই তো জীবন পুড়তে তিনি

দেখেছেন। জীবনের শুরুতে একটুখানি অসাবধান, একটুখানি অসতর্ক—তারপর সারা জীবন তার জ্বালা। সমাজে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

তরকারির ব্যবস্থা করে সরোজিনী ফিরে এলেন। কাছে বসলেন। হরিহরবাবু বললেন: একেবারেই কি জ্বলে গেল?

একটু ধরেছে।

তবু ভাল।

পল্টু না চেঁচালে একেবারেই যেত।

ঘরের ভেতর ও কী করছে?

মেকানো নিয়ে বসেছে।

হরিহরবাবু বললেন: তোমার এই তরকারি পোড়াটা আমি সহজ ভাবে নিতে পারছিনে।

কেন বলতো?

আমার মনে হচ্ছে, কোথাও একটুখানি হিসেবের ভুল হচ্ছে। সেইটে ধরে সতর্ক হবার সময় এসেছে।

সরোজিনী সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছ?

ভাববার আর তো কোন বিষয় নেই।

ও ভাবনাও তো ফুরিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ আবার নতুন করে কেন ভাবছ?

ভাবনা নিজে থেকেই এসে কাঁধে চাপছে।

সরোজিনী ভয় পেয়েছেন। তাঁর সাহসের একটা সীমা আছে। সেই সীমাকে লঙ্ঘন করবার কথা তিনি কল্পনা করতে পারেন না। আর্তনাদের মতো অসহায় স্বরে বলে উঠলেন: এ তোমার ভুতুড়ে ভাবনা, এ ভাবনা তুমি ভেব না।

নিজের মেয়ের কথা কিছু ভেবেছ কি?

না।

একটু থেমে সরোজিনী বললেন: ভাবনা করার মতো কোন পরিবর্তন এখনও দেখিনি।

সনাতন আমাকে ভাববার কথাই বলেছে।

সরোজিনী চমকে চোখ তুলে চাইলেন।

হরিহরবাবু বললেন: এ যুগের মেয়েরা নাকি শূন্যে ট্রাপিজের খেলা দেখতে চায়। আর বিধায়ক যদি খুব পারে তো মাটির উপর ডিগবাজী খেতে পারবে।

এ সব আবার কী অলক্ষুনে কথা!

কিন্তু ভাববার মতো কথা।

না না, আমাকে তুমি এ সবের মধ্যে জড়িয়ো না।

সনাতন বলছিল, বিধায়ক গৃহস্থ ঘরের ছেলে, তার যোগ্যতা সীমাবদ্ধ। উন্নতির যে মইটাকে ধরেছে, তার সিঁড়ির সংখ্যা গোনাগুনতি। তার উপর দাঁড়িয়ে বিধায়ক সার্কাসের খেলা দেখাতে পারবে না।

সরোজিনীর কণ্ঠে আবার আর্তনাদ জাগল: আমি ভয় পাচ্ছি।

ভয় কি আমিই পাচ্ছি না!

তবে এ সব কথা ভাবছ কেন?

ঐ সনাতনই তো ভাবাচ্ছে।

বেশিক্ষণ এই বৃদ্ধ দম্পতিকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হল না। বিধায়ক এসে উপস্থিত হল। সরোজিনী বুক ভরে নিশ্বাস নিলেন, বললেন: এস বাবা।

বিধায়ক নিঃশব্দে এসে কাছে বসল।

সরোজিনী বললেন: ওরা এখনি ফিরবে।

কারা ফিরবে, কোথা থেকে ফিরবে, বিধায়ক এ সব কথা জানতে চাইল না। সরোজিনীর কাছে এ সংবাদটা খুবই পুরনো।

তাঁর মনে হল না যে বিধায়ক এ কথার কিছুই জানে না। হলে নিশ্চয়ই খানিকটা কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন বোধ করতেন।

বিধায়ক আশ্চর্য হল, আজ তাকে কেউ কোন সংবাদ দেবার প্রয়োজন বোধ করছেনা। তাদের এই পুরনো পরিবেশের উপর দিয়ে বুঝি কোন পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেছে। ধুলো বালি কুটো কাটির মতো স্নেহ প্রীতি উড়ে গেছে। আছে শুধু রুক্ষ পরিচয়ের শুকনো হাড় কখানা। মাত্র দু তিনটে দিনের ব্যবধান।

হরিহরবাবু কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন : তারপর, কেমন আছ বল।

বিধায়ক এর বেশি কী আশা করে! সনাতন তো নিজের মুখেই সেদিন বলেছিল, তার কোন যোগ্যতা থাকলে উপরতলার সমাজে সেও মিশতে পারত। শিল্পীর খ্যাতি দিয়ে পয়সার অভাব খানিকটা ঢাকা যায়। অন্তত সাময়িক ভাবে। শিল্পীকে একটু শ্রদ্ধা না দেখালে এ শতাব্দীর কালচারের পরিচয় দেওয়া হয় না। সনাতন বোধহয় সেইজন্যেই তবলায় চাঁটি দেয়। তবলায় না দিয়ে ও যদি সভ্যতার মাথায় চাঁটি দিত, তাহলে বিধায়ক বেশি খুশী হত।

খুশী! না তো, সনাতন যে তার রঙ বদল করছে। রামধনুর মতো নয়, সেই বইএ পড়া বিদেশী টিকটিকির মতো। যাক সে কথা। বিধায়কের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

হরিহরবাবু বললেন : চেহারাটা শুকনো দেখাচ্ছে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

বিধায়ক সংক্ষেপে বলল : ভাল আছি।

সরোজিনী কোন বলার কথা ভেবে পাচ্ছিলেন না। শুধু এইটুকু বুঝতে পাচ্ছিলেন যে হঠাৎ কী করে নাচের তাল কেটে গেছে। এ কথাও বুঝতে পাচ্ছিলেন যে বিধায়ক এই কাটার সংবাদ রাখে।

অথচ সে নির্বিকার, মন তার নির্বিকার কি না, সে কথা বোঝা যাচ্ছে না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিধায়ক প্রশ্ন করল: পল্টু কোথায়?

পল্টু!

কথা বলার মতো বিষয় পেয়ে সরোজিনী হাঁফ ছাড়লেন, বললেন: দেখ না কী কাণ্ড। সারা দিন মেকানো নিয়ে পাগল হয়ে আছে। আজ বিকেলবেলায় ঘরের বাইরে একবারও বেরলনা।

বিধায়ক উঠে দাঁড়াল, বলল: আমি দেখছি তাকে।

বলে বাড়ির ভিতরে গেল। কেউ তাকে বাধা দিলেন না।

বিধায়কের একটা কথা জানবার ছিল। সে কথা পল্টুকেই শুধু জিজ্ঞাসা করা যায়। স্মিতা সেই সকালে বেরিয়ে এখনও ফেরেনি, না, খেয়েদেয়ে আবার বেরিয়েছে! কোথায় গেছে তারা! এমন কার সঙ্গে গেল যে বাপ মায়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন! বিধায়ক ছাড়া এমন বন্ধু তার কে আছে, সে কথা বিধায়কের জানা নেই। স্মিতা সনাতনকে সহ্য করতে পারে না, তার বাবাও পারেননা। তবে কি সেই নূতন চোপরার সঙ্গে বেরিয়েছে? তাই বা কী করে সম্ভব হবে! চোপরা তো নিজেই স্মিতাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। খবর পেয়েছিল, স্মিতা সনাতনের সঙ্গে বেরিয়েছে। তবে তারা কোথায় গেল?

অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পল্টু একটা ব্রীজ তৈরি করছে। একখানা লোহার পুল। তার কোন দিকে দৃষ্টি নেই, কিন্তু কান সজাগ ছিল, যেমন খানিকক্ষণ আগে তার সজাগ ঘ্রাণের পরিচয় পাওয়া গেছে। তার পুলের দিকে দৃষ্টি রেখেই বলল: এস বিধায়কদা, তোমার ফাগলিকে ছোট সিমলার সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি।

বিধায়ক তার পাশে বসে বলল: তার তো আর দরকার হবে না ভাই, ছোট সিমলাকে বরং অন্য কোন জায়গার সঙ্গে জোড়ো।

চোখ নামিয়ে রেখেই পল্টু বলল: সেকি, তোমার আসা-যাওয়ার কষ্ট কী করে যাবে!

বিধায়ক তেমনি ক্ষোভের সঙ্গে বলল: ছোট সিমলাকে যদি ফাগ্‌লি পৌঁছতে পারতে, তাহলে হয়তো কষ্ট কমত।

তাহলে এই পুলটার কী হত?

তাও তো বটে।

পল্টুর মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল, বলল: লক্কড় বাজারে লাগিয়ে দেব? মনোহরদার খুব কষ্ট হচ্ছে।

মনোহরদা?

চেনো না মনোহরদাকে? বাঙলা জানে না। হিন্দি আর ইংরেজীতেই সবার সঙ্গে কথা বলছে।

চোপরা সাহেবের ছেলে নাকি? সেও তাহ'লে এখানে জুটেছে! কিন্তু স্মিতা কোথায় গেল, সেই সংবাদ তার জানা দরকার। জিজ্ঞাসা করল: দিদি কোথায়?

জান না বুঝি?

তুমি না বললে কী করে জানব।

সনাতনদার সঙ্গে তো সকালবেলাতেই তারাদেবী গেল।

আর কেউ না?

আর সেই ভদ্রলোক।

মনোহর?

মনোহরদা কেন হবে! নতুন ভদ্রলোক, তাঁর নাম আমি জানিনে।

বিধায়কের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সিমলা শহরটা আজ নতুন মনে হচ্ছে। কয়েকটা দিনের ব্যবধানে সে একেবারে পুরনো হয়ে গেছে। হয় তাকে আবার ছুটতে হবে, নয় তার ফাগ্‌লির বারান্দায় বসতে হবে নির্জনে নিঃসঙ্গ হয়ে। কিন্তু কোন্ পথটা বেছে নেবে, সহসা তা ভেবে পেল না।

পল্টু একান্ত মনে তার নাট বল্টু কষছে। বিধায়ক চুপি চুপি বেরিয়ে এল। বাইরের বারান্দাতেও আর বসল না।

সরোজিনী তাকে লক্ষ্য করছিলেন, বললেন: বিধায়ক কি চলে যাচ্ছ?

আজ আসি।

ওরা এখুনি এসে পড়বে। আমি চায়ের জল বসিয়ে এসেছি।

ওরা তো ক্লান্ত হয়ে ফিরছে। আমি আর একদিন আসব।

বিধায়ক রোজ আসে, কিন্তু আজ বলল, আর একদিন আসব। বিধায়ক কি আর রোজ আসবে না! সেকি কিছু সন্দেহ করেছে! সরোজিনী এ কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে বিধায়ক পথে নামল। আজ তার পথ আর ফুরোবে না। সময় তার অফুরন্ত হল। পুরাতন পথে বিধায়ক সিমলার দিকে ফিরছে।

পথের পাশে বেয়াড়া ঝাউগাছগুলো আজ স্থির হয়ে আছে। অমন সরু সরু কাঁটার মতো পাতা, তাও নড়ছে না। নিজেদের ভারে যেন ঝুলে আছে। বিধায়কের জুতোর তলায় মড়রড় করে কী একটা জিনিস গুঁড়িয়ে গেল। কিন্তু সে ফিরে দেখল না। ওতো ঝাউএর পাকা ফল, এ যুগের সভ্যতা যে জীবনকে মাড়িয়ে যায়। জীবনের উপর দিয়ে চলেছে সভ্যতার ভারি রোলার।

এ তো সনাতনের কথা। সত্য কথা। কিন্তু বিধায়কের মনে হল, এসব কথা কোন ভণ্ডের মুখে শুনেছে। যে লোকটাকে সবাই সত্যবাদী বলে এতদিন শ্রদ্ধা করেছে, তার মুখোসটা একটু ফাঁক হয়েছে মাত্র, একেবারে খুলে পড়েনি। যত তাড়াতাড়ি সেটা খুলে পড়ে, ততই মঙ্গল। সমাজের কল্যাণ হবে। ভণ্ডরাই তো দেশের ক্ষতি করছে বেশি।

পথে আজ একটাও মানুষ নেই। বিধায়কের মনে হল, এ

রকমটি যেন কোনদিন হয় না। অন্যদিন এই পথটাকে যত নিরিবিলি চেয়েছে, তত পায়নি। এক আধটা মানুষ যেন সারাক্ষণই তাদের লক্ষ্য করেছে। কখনও আস্তে হেঁটেছে, কখনও জোরে। তবু যেন একান্ত ভাবে একা হতে পারেনি। স্মিতা হেসে বলেছে, মানুষ না থাক, ছায়াকেও তুমি ভয় পাবে।

সেই বিধায়ক আজ একেবারে একা। স্মিতারা কি এই পথে ফিরবে! ঐ বাঁকের আড়ালে যেন একটা মিষ্টি সুর শোনা যাচ্ছে। এ তো গানের সুর। স্মিতাই তো গাইছে না!

একটু আগেই সামনের পথটা দেখা যাচ্ছিল। স্মিতাকে সে দেখতে পায়নি! সে কি অন্যমনস্ক ছিল, না পথ চলছিল নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে! কণ্ঠস্বর আরও স্পষ্ট হচ্ছে। চেনা সুর। এ যে স্মিতার গান, তাতে আর সন্দেহ নেই। সেই অসমাপ্ত গানখানি :

তুমি আমায় পথ চলিতে বল,
চল পথ।
সরম ভরে মিনতি করি বল
নাই রথ।

শুধু কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই তারা মুখোমুখি হল। বিধায়কের সামনে এসে দাঁড়াল স্মিতা আর সনাতন।

স্মিতা বলল : তুমি ফিরে যাচ্ছ?

বিধায়ক সংক্ষেপে বলল : হ্যাঁ।

একটুখানি বসতে পারলে না?

না।

এবারে তাহলে ফিরে চল।

বিধায়ক এবারেও না বলল।

হাসল সনাতন।

ভারি হিংসুটে।

বলে স্মিতা এগিয়ে গেল সনাতনের সঙ্গে।

বিধায়ক দাঁড়িয়ে থাকল না। সেও চলবে। স্মিতা আর সনাতনের মতো সেও এগিয়ে যাবে। পৃথিবীতে কেউ থেমে থাকে না। সে কেন থামবে!

স্মিতা সেই চলবারই গান গাইছে ঃ

তুমি আমায় পথ চলিতে বল।

তারপর কি সে সনাতনকে বলবে ঃ

তুমি আমায় গান গাহিতে বল।

বিধায়ক উৎকর্ণ হয়ে শুনল। না, স্মিতা এখনও সে গানখানা গাইছে না ঃ

আমি থাকি দূরের পানে চেয়ে,
ভাবনা আমার পরাণ গেছে ছেয়ে,
শুধু গান কেন, শুধু প্রাণ কেন,
তুমি সব নাও।

গাইলেও তার বলবার কিছু নেই। সে যে তারই লেখা গান।

আঠারো

কয়েকটা দিনের মধ্যেই সিমলা সরগরম হয়ে উঠেছে। কালী-বাড়িতে আড্ডার চেয়ে কাজ হচ্ছে বেশি। নূতন যাত্রীকে আর থাকবার ঘর দেওয়া হচ্ছে না। পূজার জন্যই অনেকগুলো ঘর খালি রাখা দরকার। পূজার জিনিসপত্র, ভোগের জিনিসপত্র, আরও অনেক রকম উটকো কাজ। বাঙালীরা গিয়ে মারওয়াড়ী ধর্মশালাতেও উঠছে। খাবার একটু অসুবিধে। ঘরের ভিতর নিরামিষ খেতে হয়। সরকারী ডাক বাংলো আর রেষ্ট হাউসগুলো ভরে উঠেছে, রেলের হলিডে হোমেও আর জায়গা নেই। এবারে হোটেলের ঘর আস্তে আস্তে ভরছে। সিমলার রাস্তা আর নির্জন নয়। আর কয়েকটা দিন পরে পথের উপর মিছিল বার হবে।

কাপুরদের মেয়ের নাম মালতী। সেই মালতী তার নির্দিষ্ট সময়ের কয়েকদিন আগেই সিমলায় এসে গেল। প্রথমেই মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করল। এত ডাকাডাকি কেন!

কেন তা নিজেই বুঝতে পারবে।

বুঝবার আগে বলতেও তো পার।

বিরক্ত ভাবে মিসেস কাপুর বললেন: সব কথা বলা যায় না।

মালতী ঠোঁট ওল্টাল।

মিসেস কাপুর মিস্টার কাপুরকে তাড়া দিলেন: আর কতক্ষণ বসে থাকবে?

কেন বলতো! বসে আরাম করবার জন্যেই তো এখানে এসেছি।

আরাম যথেষ্ট করেছ। দয়া করে এবারে ওঠ।

নিতান্ত অনিচ্ছায় মিস্টার কাপুর উঠলেন। ড্রেসিং গাউন খুলে একটা জ্যাকেট পরলেন। বললেনঃ কী করতে হবে বল।

চল একবার চোপরাদের বাড়ি।

মালতী শাড়ি বদল করছিল, বললঃ চোপরা কে?

চোপরাদের মনে নেই, দিল্লীর মিরদাদ রোডের চোপরা?

মালতীর মনে পড়ল না। তাঁরা যে অপরিচিত নন, এইটুকুই শুধু বুঝল।

পথে নেমে মিস্টার কাপুর বললেনঃ এত তাড়াতাড়ি কেন বেরলে, বুঝতে পাচ্ছি না।

সবই তো তুমি একটু দেরিতে বোঝ।

অনেক কিছু বুঝতেও পারিনে।

বোঝালেও বোঝ না।

সত্যিই, ভগবানের বিচার আছে। তোমার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন বলেই এই সংসার সমুদ্র পার হয়ে যাচ্ছি।

এই সংলাপে কোন তিক্ততা নেই বলেই মালতী হেসে উঠতে পারল।

মিসেস কাপুর বললেনঃ সিমলায় কেউ বসে থাকতে আসে না, আসে বেড়াতে। কারও বাড়ি বেড়াতে গেলে সকাল সকাল যাওয়া দরকার। তারপর—

কথা কইতে মিসেস কাপুরের বেশ কষ্ট হচ্ছে। দেহটা তাঁর মেয়ের মতো তন্বী ময়, একটু বেশি ভারি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে চড়াই ভেঙে বড় রাস্তা। এই পথটুকু মুখ বুঁজেই চলা উচিত। কিন্তু তা পারেননি। কথার উত্তরে কথা, থামলেই যে পরাজয়। তাই মিস্টার কাপুর বললেনঃ তারপর কী?

মায়ের কষ্ট মালতী দেখতে পাচ্ছিল। বললঃ তারপর এক-সঙ্গে বেড়াব।

বড় রাস্তায় পৌঁছে মিসেস কাপুর খানিকক্ষণ দাঁড়ালেন। বুক ভরে দম নিলেন। তারপর ভর্ৎসনা করলেন স্বামীর নির্বুদ্ধিতার : অসুরের মতো দেহ কিনা, পাতালটাই পছন্দ হয়েছে।

এ নিত্যকার ব্যাপার। মিস্টার কাপুর এক সাহেবের বাড়ী কিনেছেন পছন্দ করে। খানিকটা নিচে নিরিবিলি জায়গায়। বাড়ি দেখে মিসেস কাপুরেরও পছন্দ হয়েছিল। রোদ আসে, বরফের পাহাড়ও দেখা যায়। যেমন ফিটফাট বাড়ি, তেমনি ফিটফাট বাগান। সাহেবের রুচি ছিল। কালা আদমির শাসন শুরু না হলে আরও কিছুদিন থাকা চলত। বাড়ি থেকে বেরবার সময় মিসেস কাপুর তাঁর পছন্দের কথা ভুলে যান, নিন্দা করেন স্বামীর বিষয়বুদ্ধির।

মিস্টার কাপুরের প্রসন্ন মেজাজ সারাক্ষণ অক্ষুন্ন থাকে। দীর্ঘ দিন ব্যবসা করে এই গুণটি অর্জন করেছেন। অন্যদিন অভিযোগের উত্তরে হেসে বলেন, উর্বশীর পছন্দে কিনেছি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুঃখ করেন, সেই উর্বশীর যে আজ এই দশা হবে তাকি জানতাম! আজ মেয়ে সঙ্গে আছে বলে মিস্টার কাপুর শুধু হাসলেন।

এই হাসি দিয়েই তুমি করে খাবে। গা জ্বলে যায়।

মালতী দিল্লীর কথা ভাবছিল। বেশ কাটছিল তার দিনগুলো। প্রজাপতির পাখার মতো রঙ বেরঙের হাল্কা দিন। কোন দুঃখ নেই, দায়িত্ব নেই, নেই শাসন বন্ধন। জীবনের মৌচাকে তিলে তিলে মধু সঞ্চয় নয়, নিষ্ঠুর হাতে ভেঙ্গে মধু লুণ্ঠন। মালতী কি সেই জীবন এই সিমলায় ফিরে পাবে!

শহরের পশ্চিম প্রান্তে রাজ্যপাল ভবন। কাপুর পরিবার অত দূরে থাকে না, কাছেও না। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর পাশ দিয়ে হোটেল সিসিলের সামনে দিয়ে সরকারী দপ্তরগুলো ছাড়িয়ে রিজ,

সেখান থেকে লক্কর বাজার। সিমলার আবহাওয়ায় ক্লান্তি জমে নেই বলেই মানুষ এত হাঁটতে পারে। মালতী উসখুস করছিল, চারিদিকে চাইছিল পরিচিত মুখ দেখবার লোভে। কিন্তু পরিচিত দেখল শুধু বড় বড় বাড়ি ঘর, দোকান পাট। মানুষ যা দেখল তারা সবই নূতন। এমন কি তার বাবা মা যাকে দেখে আনন্দে গদ গদ হয়ে উঠলেন, তাকেও মালতীর নূতন মনে হল। মিসেস কাপুর বললেন: আমার মেয়ে মালতী। মনোহরকে তুমি ভুলে গেলে? আমরা তো এদের কাছেই যাচ্ছি।

মনোহর সবার দিকেই ঘনিষ্ঠ ভাবে হাত বাড়াল। মালতীর দিকে হাত বাড়াবার সময় তার মুখের দিকেও তাকাল ডুবুরির দৃষ্টি নিয়ে। মালতী হাওয়ার মতো হাল্কা শাড়ি পরেছে। অঙ্গের অধোবাস বহির্বাসের চেয়ে স্পষ্ট। মেয়েটা কি তার মনও মেলে দেয় এমনি করে! মালতী আলতো ভাবে তার হাত বাড়াল, দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন কৌতুক।

মনোহর বলল: মনে রাখা সত্যিই শক্ত।

মালতী বলল: আপনাকে অনেক বছর আগে দেখেছি।

মনোহরের সে কথা মনে পড়ল না, কিন্তু মালতী বলল: সেই যে সেবারে দিল্লীতে আপনার বিলেত যাবার উপলক্ষ্যেই বোধ হয় পার্টিটা হয়েছিল।

মালতীকে মনোহর আর একবার ভাল করে দেখল। এই সুন্দর মেয়েটাকে সেদিন দেখেছিল, বলে তার মনে পড়ল না। দেখে থাকলে কি এমন করে ভুলে যায়!

মালতীর উত্তর দিলেন মিসেস কাপুর, হেসে বললেন: তুমি তখন ফ্রক পরতে, ছোট্ট মেয়েটি!

মালতীর লজ্জা দেখে মিস্টার কাপুর হাসলেন। মনোহর নিজের বয়সের গৌরবটুকু নিঃশব্দে উপভোগ করল।

পথে দাঁড়িয়ে গল্প জমে না। গল্পের জন্য রিজের বেঞ্চিতে বসতে হয়। তা না হলে মনোহরকে ফিরতে হয় নিজের বাড়িতে। মনোহর সেই প্রস্তাবই করল। পিছন ফিরে বলল: আসুন।

মিস্টার কাপুর বললেন: তুমি কোথাও বেরিয়েছিলে?

মনোহর লক্কড় বাজারের দিক থেকে এসে বামহাতে মোড় নিচ্ছিল। সে পথ নিচে নেমে সিমলার পূর্ব প্রান্তে গেছে। আরও এগিয়ে ছোট সিমলা। কিন্তু সে সব কথা সে বলল না। বলল: এই তো বেড়ানো। বসে বসে সময় কাটে না, ভাবছিলুম কোথায় যাই।

মিসেস কাপুর বললেন: সত্যিই তো, তোমাদের সময় কী করে কাটবে!

মনোহর মালতীর দিকে তাকাল। মালতী হাসল।

মনোহরের পা আজ আবার তালে তালে পড়ছে। মালতী শুনল, মনোহর গুণগুণ করে একটা সুর ধরেছে। কথা শোনা যাচ্ছেনা, শুধু সুর। এক দিন স্মিতার সঙ্গে একা চলবার সময়েও সে এই গান গেয়েছিল স্পষ্ট স্বরে:

ইওর আইজ আর দি আইজ অফ এ উওম্যান ইন লাভ।

নতুন কোন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলেই মনোহরের এই গানটি মনে পড়ে। নিজেকে তখন রোমিও মনে হয়। আর ভাবে, তার জুলিয়েটের চোখ হয়েছে প্রেমে-পড়া চোখের মতো। তফাৎ শুধু এক জায়গায়—এ রোমিও সবাইকে জুলিয়েট ভাবে, আর জুলিয়েট বদল হয় প্রহরে প্রহরে।

এই লোকটির দিকে তাকিয়ে মালতীর মন্দ লাগছিল না। দিল্লীর ছেলেরা ঠিক এমন নয়, এমন নেচে নেচে পথ চলে না। বুড়োদের সামনে গান গায় না এমন গুণগুণ করে।

চোপরা দম্পতি বাইরের বারান্দায় বসেছিলেন বেতের চেয়ারে। কাপুরদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন। আর আনন্দ প্রকাশ করলেন

মালতীকে দেখে। মিসেস চোপরা বললেনঃ আরে মালতী কবে এলে ?

এইতো এলাম।

মিসেস কাপুর বললেনঃ আজই তুপুরের গাড়িতে।

মনোহর সময় নষ্ট করেনি। ভিতরে গিয়ে হাঁক ডাক করে বেয়ারাকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। ফিরে এল তুখানা চেয়ার হাতে ঝুলিয়ে। কিন্তু সঙ্কীর্ণ বারান্দায় স্থানাভাব। চারখানা বেতের চেয়ারেই স্থানটা ভরে গেছে। কাজেই সে ফিরে গেল। কাপুরেরা বসে পড়েছিলেন। মিসেস কাপুর মালতীকে ভিতরে পাঠালেন।

সিনিয়ার চোপরা বললেনঃ মনোহরের সঙ্গে কোথায় দেখা হল ?

মিসেস কাপুর বললেনঃ এইতো, বাড়ির সামনে।

হুঁ।

চোপরা সাহেব চুপ করলেন।

মিসেস চোপরা বললেনঃ বেচারা একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে।

তাতো উঠবেইঃ মিসেস কাপুর উত্তর দিলেনঃ বিলেতে কত কাজ, কত পড়াশুনো, কত—

চোপরা সাহেবের দিকে চেয়ে তিনি থেমে গেলেন।

মিসেস চোপরা বললেনঃ সিমলা হল আমাদের মতো বুড়োর জন্যে। খাও দাও আর পাহাড়ের দিকে চেয়ে বসে থাক।

মিস্টার কাপুর বললেনঃ এই বয়সেই বৈরাগ্য, এখনও যে অনেক বাকি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিসেস চোপরা বললেনঃ বাকি তো মরণের। জীবন অনেক দিন হল ফুরিয়ে গেছে।

এই দীর্ঘশ্বাসের আড়ালে বুঝি দীর্ঘ দিনের বেদনা আছে। কোন অতৃপ্তি, কোন তৃষ্ণা। মাসের সংক্রান্তি আছে, কিন্তু তৃষ্ণার নেই। মাস পূর্ণ হয়ে হয়ে বয়সকে ঠেলেছে বার্ধক্যের দিকে, কিন্তু পুষ্পে

কীট সম তৃষ্ণা আজও জেগে আছে। এই জীবনটা ফুলের মতো সুন্দর হতে পারত, প্রজাপতির পাখার মতো নানা রঙে রঙীন। কিন্তু তা হল না। ফানুষের মতো উড়ে আর চীনা লণ্ঠনের মতো জ্বলে নিঃশেষে পুড়ে গেল। আজ একটা পোড়া জীবনের ছায়া দেখে মিসেস চোপরা চমকে উঠছেন। কিন্তু কেন এমন হল! কয়েকটা দিন আগেও তো তাঁর অনেক স্বপ্ন ছিল, অনেক আশা, সার্থক জীবনের জন্য একটা আকুল আকূতি। হঠাৎ কেন তা ফুরিয়ে গেল। সে কি মনোহরকে দেখে! মিস্টার চোপরা তো অনেক আগেই এ কথা বলেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেন নি। বিশ্বাস করলে তাঁর বুক ভেঙ্গে যেত। কিন্তু আজ! আজও তো তাঁর বুক তেমনি শক্ত আছে। আগের মতোই সহজ ভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, কথা বলছেন। শুধু একটু ব্যথা খচখচ করে বিঁধছে, আর বেদনায় বুকটা টনটন করে উঠছে।

বেয়ারার ট্রেতে পানীয় এল। মনোহর তা নিজে পরিবেশন করল। মালতীও সঙ্গে ছিল, সে নিল সঙ্কোচের সঙ্গে। নিয়েই ভিতরে গেল। মনোহর এসে তার পাশে বসল। বলল: সিমলা নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগে।

ক্বচিৎ কদাচিৎ।

কী রকম?

দিল্লী থেকে একবার আমরা দল বেঁধে এসেছিলাম। আমরা কলেজের মেয়েরা। এখান থেকে মাশোব্রা কুফ্রি চিনিবাংলো —হৈ হুল্লোড় করে দিব্বি কাটিয়েছিলাম।

এ সমস্ত নাম মনোহরের মনে এল না। বুঝতে পেরে মালতী বলল: সিমলার কথা আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন।

সত্যিই তাই।

মালতী বলল: শহরে আর কী আছে? জাথু আম প্রসপেক্ট হিল

উঠতেই প্রাণ যায় বেরিয়ে। তা নয়তো সঙ্গোলি গিয়ে বরফ দেখুন। চোখে দেখে কি প্রাণ ভরে?

ঠিক বলেছেন, একেবারে খাঁটি কথা। কয়েকটা দিনেই একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছি।

সেবারে আমরা ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিলাম।

মনোহরের দু চোখ উঠল চকচক করে।

মালতী বলল: বিলেতে নিশ্চয়ই আপনি হাইকিং করেছেন?

তার চেয়েও ভাল স্বাদ পেয়েছি।

কী রকম?

আগে আপনার গল্প শুনি।

ঘন পাইন আর ওক গাছের জঙ্গলের ভিতর চমৎকার পিক্‌নিকের জায়গা মাশোব্রা। কটেজ আছে, কাছে একটা রেস্ট হাউসও আছে, আর আছে অগনিত পিক্‌নিকার। ছেলেরা নালদেরায় পালিয়ে যায়। দেবদারু বনের ভিতর গল্‌ফের চমৎকার মাঠ। আরও এগোতে চান? চলে যান তত্তাপানি। শতদ্রু নদী দেখুন, আর দেখুন গন্ধকের প্রস্রবণ।

মনোহরের চোখ ছিল মালতীর দিকে, মন কোন্ দিকে ছিল সেই জানে। এইবারে তুড়ি দিয়ে বলল: আইডিয়া।

মালতী হাসল। বলল: এতেও যদি না শখ মেটে, চলুন চিনি বাংলোর কাছে স্কি করতে, আর রিঙ্কে স্কেটিঙের জন্যে।

মনোহর দু তিনবার তার গেলাস ভরেছে, এবারে মালতীর গেলাসে আরও খানিকটা ঢেলে দিল। মালতী আপত্তি করল না। বলল: বিলেত আপনার কেমন লেগেছে?

একটা জীবন্ত দেশ। আপনি ঘুরে এসেছেন?

না।

না!

মনোহর যেন মর্মাহত হল, বলল: বিলেত যাননি!

এমন ভাবে বলল যে মালতীর লজ্জা পাওয়া উচিত। কিন্তু মালতী বলল: ভাবছেন কেন, শিগগিরই ঘুরে আসব।

আমাকে সঙ্গে নেবেন তো?

মালতী হেসে উঠল।

হঠাৎ কী মনে করে মনোহর বলল: একটু বসুন, আমি এখনই আপনাকে বিলেত দেখাই।

বলে পাশের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেশিক্ষণ নয়, কয়েকটিমাত্র মুহূর্ত পরেই মনোহর একখানা অ্যালবাম হাতে ফিরে এল। নিজের গ্লাসটা সরিয়ে মালতীর চোখের নিচে তার বিলেতের স্মৃতির পাতা খুলে ধরল।

মালতী শুধু বিলেতের ছবিই দেখলনা, দেখল মনোহর চোপরাকে—নানা জায়গায় নানা ভঙ্গিতে, নানান মেয়ের সঙ্গে। একটি মেয়ে যেন বারে বারে এসেছে। ব্রাইটনের সমুদ্র সৈকতে, কিউ গার্ডেনের লতাকুঞ্জে, কিংবা লেক ডিস্ট্রিক্টের নিরিবিলি পটভূমিতে।

মালতী বলল: একে যেন চেনাচেনা লাগছে!

সত্যি!

মালতী সামনের দিকে পাতা না উল্টে পিছনের পাতা উল্টাল। এ কাজে মনোহর তাকে সাহায্য করছিল, এবারে বাধা পেল। দুজনের হাত দুদিক থেকে এসে উপরে ছোঁয়াছুঁয়ি হল। মালতী চমকে উঠে হাত সরিয়ে নিল না। মনোহরের চোখের দিকে চেয়ে একটু হাসল।

কাঠের পাটাতনের উপর হঠাৎ মনোহরের জুতোর তাল পড়ল। আর একটা সুর। অস্পষ্ট কথাগুলি কি স্পষ্ট হয়ে উঠছে:

লাভ ইজ এ মেনি স্প্লেণ্ডার্ড থিং।

উনিশ

অফিসে সনাতন বিধায়ককে জিজ্ঞাসা করেছিল: তুমি আজ-কাল ছোট সিমলায় যাচ্ছ না?

বিধায়ক কোন উত্তর দিল না।

সনাতন বলল: হঠাৎ এই বৈরাগ্য কেন?

বিধায়ক এ কথার উত্তর দিলনা।

চল, আজ তোমার সঙ্গে আমিও যাব।

বিধায়ককে দেখে সনাতন হাসল।

হাসলে যে?

তোমাকে কথা বলাবার জন্যে।

কাজেই বিধায়ক আবার নীরব হল।

সনাতন বলল: শুনেছি, তুমি ভূগোলে ভাল ছাত্র ছিলে, ইতিহাসেও। কলেজে দর্শন আর মনস্তত্ত্ব পড়ে মাথাটা বেশ কিছু গোলমাল হয়েছে। এখন আর সোজাসুজি কিছু দর্শন করতে চাও না।

সনাতন জানে, বিধায়ক কোন প্রশ্ন করবে না। তাই নিজেই বলল: যদি এই যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে চাও, তবে দৃষ্টিটা উদার কর। এই যে তুমি রক্ত-মাংসের মানুষটা আমার সামনে বসে আছ, মনে রাখবে এর মালিক তুমি নও। এর মালিক এই নতুন সমাজ। তোমার নিজের ইচ্ছামতো তুমি চলবে না, চলবে সমাজের প্রয়োজন মতো।

ইতিহাস ভূগোল দর্শনের সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ?

তুমি ভাব কোন সম্বন্ধ নেই। এবার থেকে ভাববে, আছে। কেন আছে, তা বলছি।

সনাতন নস্যির কৌটো খুলে এক টিপ নস্যি নিল। তারপর বলল ঃ তোমার ভূগোলে লেখা ছিল, আমাদের এ দেশ ভারতবর্ষ, আর সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে বিলেত হল সাহেবদের দেশ। আজকের ভূগোলে লেখা উচিত, ভারতবর্ষ আর বিলাত নামে দুটো দেশ এক সময় ছিল বটে, আজ নেই। চালে ডালে মিলে খিঁচুড়ি হয়ে গেছে। প্রগতি অব্যাহত থাকলে কোন্ দেশ কার ছিল তা চিনতেও ভবিষ্যতে কষ্ট হবে।

সনাতন তার নোংরা রুমাল বার করে নাকটা মুছে ফেলল। তারপর বলল ঃ এবারে ইতিহাসের কথা বলি। পুরাণ পড়েছ ?

না।

তবে কী জিজ্ঞাসা করি ! রামায়ণ মহাভারত ?

বোধহয় পড়েছিলুম।

আচ্ছা মনে করে দেখ তো সব কথা বিশ্বাস করেছিলে কিনা !

অনেক কথাই করিনি।

ঠিক মনে আছে। কেন করনি তা মনে পড়ছে ?

অনেক অসম্ভব ঘটনা আছে।

ইতিহাসে নেই ?

না।

এ যুগের সঠিক ইতিহাস যদি লেখা হয়, তাহলে তোমার পড়া ইতিহাসের অনেক কথাই অবিশ্বাস্য মনে হবে।

যেমন ?

এই ধর, শাহজাহানের তাজমহল রচনা। এ জিনিষটা প্রেমের পরাকাষ্ঠার পরিচয় বলে তোমরা স্বীকার করেছ। এ কালের স্ত্রী পুরুষ শুনে হাসবে। প্রেম একটা বিলাস এবং বিবাহ একটা জৈব অভ্যাস—এই হল বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার কথা। তুমি তাকে অবজ্ঞা করে সভ্যতাকেই অস্বীকার করছ। এর পরিণাম অমোঘ হবে।

ভবিষ্যতের ইতিহাস পাঠক তোমার প্লেটনিক লাভ পড়ে কৌতুক বোধ করবে, নয় অবিশ্বাস করবে এই ঘটনাকে।

দর্শন আর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কী বলছিলে?

সনাতন উত্তর দিল: দর্শন কর সোজাসুজি। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ব'লো না, বল জগৎ সত্য ব্রহ্ম মিথ্যা। যা ঘটতে দেখছ, বীরের মতো সাহস নিয়ে দেখ। তার আত্যন্তিক সত্যের কথা ভুলে যাও। কেননা, সে রকম কোন সত্য কোন ঘটনার পিছনে নেই। মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে একমাত্র সত্য হল, মানুষের মন দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। সুতরাং হে বিধায়ক, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।

বিধায়ক উঠল না, জাগলও না, সনাতন বলল: যদি তুমি সুস্থ হতে তাহলে সহজ ভাবে হেসে উঠতে। তোমার মনে যে ঘন মেঘ জমেছে, তার খানিকটা হাল্কা হত। বাকিটা পরিষ্কার হত খোলাখুলি আলাপ করে।

সনাতন বিধায়কের হাত ধরে টানল, বলল: চল, বেরিয়ে পড়ি।

বিধায়ক আর আপত্তি করল না, ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে উঠে পড়ল। একে একে সবাই বেরচ্ছে।

পথে নেমে সনাতন বলল: চোপরার সঙ্গে তো আলাপ হয়েছে, কেমন দেখলে তাকে?

ভাল।

সনাতন কঠিন দৃষ্টিতে বিধায়কের মুখের দিকে চেয়ে বলল: স্মিতার সঙ্গে তাকে কেমন মানাবে?

বিধায়ক চমকে উঠল: কী বলছ তুমি?

বলছি, চোপরার সঙ্গে স্মিতার জোড় কেমন মানাবে?

হঠাৎ এ কথা কেন?

উত্তরটা ভেবে রাখ বন্ধু, বাঁড়ুয্যে মশাই জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়ে বিধায়ক প্রশ্ন করল : স্মিতার বাবা?

আজ্ঞে হ্যাঁ, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধায়কের এ কথা বিশ্বাস হলনা, বলল : অসম্ভব। এ তাঁর আদর্শের বিরুদ্ধ কথা।

এ নিয়ে তর্ক এখন থাক। পরে জানতে চেয়ো, কী করে এমন সম্ভব হল, আর আদর্শের কী মানে।

স্মিতার মা কী বলেন?

তিনি কি কখনও কিছু বলেছেন যে আজ বলবেন!

বিধায়ক আড়ষ্ট হয়ে গেছে। পা ফেলছে যুদ্ধযাত্রী সৈনিকের মতো। থামবে না, থামবার হুকুম নেই। গুলি করবে, কিংবা গুলিবিদ্ধ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে। আর কোন তৃতীয় পথ নেই।

সনাতন তাকে ভাববার অবকাশ দিল। কোন প্রশ্ন করল না, কোন উত্তর চাইল না। জনবহুল পথ তারা নিঃশব্দে অতিক্রম করে চলল।

বিধায়ক আজ অনেক কিছুর সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছে না। মনোহর চোপরা সেদিন সকালবেলায় তার বাড়ি এসে যা বলে গেল, সনাতন আজ তার ঠিক উল্টো কথা তাকে বিশ্বাস করতে বলছে। তারা দুজনেই ভুল বুঝেছে, না তাকে ভুল বোঝাচ্ছে! কিন্তু এই ভুল বোঝাবুঝি কেন শুরু হল? এ সমস্তর মূলে কি স্মিতা নিজে? বিধায়কের ভাবনা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

সনাতন হঠাৎ হেসে উঠল।

বিধায়ক চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল : হাসলে যে?

মানুষের মূর্খতা দেখে হাসছি।

তুমি কি মানুষ নও?

সবাই স্বীকার করে না।

মানুষের কি নতুন কোন মূর্খতা দেখলে?

প্রতিদিনই নতুন কিছু দেখছি।

বিধায়ক কিছু শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সনাতন বলল: মানুষ যাকে যত বেশি চেনে, তাকে তত বেশি সন্দেহ করে।

বুঝিয়ে বল।

এই তোমার কথাই ধর। স্মিতাকে তুমি সব চেয়ে বেশি চেন। অন্তত চেনা উচিত। তারই সম্বন্ধে নানা সন্দেহে তুমি ভেঙ্গে পড়েছ। আমাকেও তুমি কম চেন না, অথচ একটা অপরিচিত লোকের কথায় তুমি আমাকেও সন্দেহ করতে শুরু করেছ।

এ কথা কে তোমাকে বলল ?

প্রশ্ন শুনে সনাতন হাসল।

বিধায়ক চটে উঠল: তুমি আজকাল অকারণে হাসছ।

হাসি একটা আনন্দের অভিব্যক্তি, অথবা হেসে মানুষ আনন্দ পায়। স্বার্থপররাই এতে আপত্তি করে, সমাজে স্বার্থপরের সংখ্যা আর বাড়িয়ো না।

ছোট সিমলায় একটা থমথমে আবহাওয়া চলছে। বিধায়ক আসছে না, নিশ্চয়ই অপমানিত বোধ করেছে। করবেই। অগ্রহায়ণে যার সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়েছে, মেয়ে তার জন্য অপেক্ষা না করে যার তার সঙ্গে বেড়াতে যাবে। সরোজিনীর চোখে এ যখন ভাল লাগেনি, তখন বিধায়কের চোখেও লাগবে না। হাজার হলেও সে পুরুষ মানুষ, আর দোষে গুণে মেশানো মানুষ, দেবতা নয়। সরোজিনী আজ একটু আগে স্বামীর কাছে এই অভিযোগ জানিয়ে বাড়ির আবহাওয়াটা থমথমে করে ফেলেছেন।

হরিহরবাবু কোন উত্তর খুঁজে পাননি। চোপরার প্রতি তাঁর কোন দুর্বলতা নেই, এই যুক্তি দিয়েই পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিলেন। সরোজিনী মানবেন কেন! মেয়েকে তাদের পার্টিতে যেতে দিয়েছেন,

একা ছেড়ে দিয়েছেন সিনেমায় যেতে, এমন কি নিজে সপুত্রকন্যা হোটেলের নিমন্ত্রণ রক্ষাও করে এসেছেন। এ শুধু ভদ্রতা বললে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হবে।

এর পরেও সরোজিনীর অস্ত্র ছিল। সে ব্রহ্মাস্ত্র। মেয়ে শুনতে পাবে, এই ভয়ে তা নিক্ষেপ করেন নি। চোপরা ছেলে কেমন, এই কথা হরিহরবাবু জানতে চেয়েছিলেন। মেয়ের বিয়ে ঠিক করে একটা পাঞ্জাবী ছেলের সম্বন্ধে এমন কথা তিনি কেন ভাববেন! কেন তাঁর মন এমন বিক্ষিপ্ত হবে! এই বয়সে বাপের যদি মতি এমন হয় তো মেয়ের কী দোষ! সে তো আরও বেশি অস্থির হবে!

বাড়ির বারান্দায় একখানা পা দিয়েই সনাতন বুঝল যে খানিকক্ষণ আগে এখানে একটা ছোটখাট ঝড় বয়ে গেছে। বিধায়ককে দেখে হরিহরবাবু খুশী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করতে পারলেন না। এই আনন্দ প্রকাশ হয়ে পড়লে তাঁর পরাজয়ের কথাও যেন প্রচার হয়ে যাবে। সনাতন তাঁকে একটা নমস্কার করে বলল: আজ কি কঠোপনিষদ পড়ছেন?

হাতের বইখানির কথা হরিহরবাবুর মনে পড়ে গেল। চাদরের নিচে থেকে বার করে বললেন: তাইতো!

আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পাচ্ছিলুম যে কঠোপনিষদের মতো কঠিন কিছু পড়ছিলেন।

হুঁ।

সনাতন তার নস্যির কৌটো বার করল। আর হরিহরবাবু বিধায়ককে প্রশ্ন করলেন: তোমার শরীর কি ভাল নেই?

উত্তর সনাতন দিল, বলল: মনটা অসুস্থ।

কেন?

আপনিও তো সুস্থ বোধ করছেন না।

হরিহরবাবু ক্ষেপে উঠলেন, বললেন: কে বললে এ কথা?

আমার অনুমান তো আপনি মেনে নিলেন দেখছি।

মানে ?

মানে খুবই সোজা। অনুমান মিথ্যে হলে মানুষ হাসে, রাগে সত্যি হলে। আপনি যখন চটেছেন, তখন অনুমানটা সত্যি বুঝতে হবে।

সরোজিনী ঘোমটা টেনে বাইরে এলেন। বিধায়ককে দেখে খুশী হলেন অপরিমিত, বললেন: পালিয়ে যেয়ো না, আমি তোমাদের চা আনছি।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, পালিয়ে যাবার জন্যে আমরা আসিনি। স্মিতা ভিতরে থাকলে বাইরে পাঠিয়ে দেবেন।

পল্টুর সঙ্গে ও একটু বাইরে বেরিয়েছে।

চোপরাদের বাড়ি ?

না না, সেখানে কেন যাবে!

গেলেও তাকে পাবে না। মনোহর এখন মাল্‌তীকে নিয়ে ব্যস্ত আছে।

মালতী ?

মালতী নয়, মাল্‌তী। হসন্ত দিয়ে বলুন বাল্‌তির মতন।

সরোজিনী কৌতূহলী হলেন: সে আবার কে ?

মাল্‌তী কাপুর ওঁদের বন্ধু ব্যবসাদারের মেয়ে। একই সমাজের, জমেছে ভাল।

হরিহরবাবু ভয় পেলেন। সনাতনকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না। যা মুখ, হয়তো এমন বেফাঁস কথা বলে ফেলবে যে শেষে পস্তাতে হবে। তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে বললেন: তুমি চায়ের ব্যবস্থা কর।

সরোজিনীর কৌতূহল নিবৃত্তি পুরোপুরি হলনা। তবু সরে যেতে হল।

সনাতন বলল: সত্য অপ্রিয় বলি বলে অশ্লীল বলিনে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করি বলে সমাজের নোংরামি ঘাঁটা আমার পেশা নয়। মহিলার সম্ভ্রম রক্ষা করে কথা কইতে আমি জানি, আমার সে পরিমাণ জ্ঞান আছে।

হরিহরবাবু বললেন: আমাদের সন্দেহ আছে বলে সাবধান হই।

এটা দুঃখের কথা। উপনিষদ পড়ে মানুষের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয় শুনেছি, ঘোলাটে হয় না।

আমার দৃষ্টি কি ঘোলাটে হয়েছে?

হরিহরবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

বিধায়ক বাধা দিয়ে বলল: তুমি থাম সনাতন। বলবার কথা না থাকে, চুপ করে থাক।

চুপ করে থাকাই আমার উচিত, কিন্তু তার চেয়ে বড় কর্তব্য সামনে দেখতে পাচ্ছি।

হরিহরবাবুর সম্মান রক্ষার জন্য বিধায়ক নিজে তর্কে প্রবৃত্ত হল। বলল: কে তোমার ওপর কর্তব্য চাপিয়েছে?

কেউ না।

তবে?

মানুষের একটা ধর্ম আছে। নিজের চারিদিকে মানুষকে ধর্ম ভ্রষ্ট হতে দেখলে তাকে জাগিয়ে দেওয়া মানুষেরই কর্তব্য।

খুব বড় বড় কথা বলছ দেখছি।

কথাটা ছোটই, শুনতে বড় লাগছে। রাস্তার ধারে কেউ পাঁচ আইন অমান্য করলে আমরা মুখ ফিরিয়ে চলে যাই। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তার হেনস্তার শেষ হবে না জেনেও কিছু বলি না। তাকে যদি আইনের কথা স্মরণ করিয়ে ঠিক জায়গাটি বাৎলে দিই, তাহলে কি অন্যায় হবে?

অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা।

বাঁড়ুয্যে মশাইএর কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।

এবারে আর বাধা কেউ দিল না। সনাতন নিশ্চিন্তে বলল: অনুগ্রহ করে উপনিষৎ আপনি আর পড়বেন না।

কেন?

উপনিষৎ পড়ে ভুলে যাবার জিনিস নয়, ও আত্মসাৎ করবার জিনিস। দীর্ঘদিন গোলামি করে আমাদের হজম শক্তি শেষ হয়ে গেছে। অমন গুরুপাক জিনিষ এখন বদ হজম হবার সম্ভাবনা।

হরিহরবাবুর দৃষ্টি আরও কঠিন হল। কিন্তু সনাতন দমল না, বলল: আপনি রাগ করবেন না। চাঁদে গিয়ে বসবাস করব, এ কথা ভাবতে বেশ লাগে, কিন্তু সেই চেষ্টায় আত্মহারা হলে লোকে পাগল বলে।

চাঁদ যদি খসে পড়ে?

তাই কখনও পড়ে? শুনেছি, মাটির নিচে স্তরে স্তরে জল আছে, কিন্তু এক স্তরের জল আর এক স্তরে গিয়ে মেলে না। পৃথিবীতে মানুষের সমাজেও এই নিয়ম। সমাজের নানা স্তর, কিন্তু প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন, তেল আর জলের মতো আলাদা।

ঘরের ভিতর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বোধহয় সরোজিনী চা আনছেন। সনাতন তাড়াতাড়ি বলল: দেহের মিলন তো মিলন নয়, মনের মিল কখনও সম্ভব কিনা দেখতে বাকি আছে।

বিধায়ক উঠে দাঁড়িয়েছিল। এবারে সরোজিনীকে দেখতে পেয়ে তাঁর হাত থেকে চায়ের ট্রে কেড়ে নিল।

কুঁড়ি

সকাল থেকে মালতী বাড়ি সাজিয়েছে। প্রথমে বাইরেটা, তারপর ভিতরে। বাইরের বাগানে মালির যত্নের সীমা ছিল না। মালিকরা কখন আসবেন, তার কোন ঠিক নেই। বেয়াড়া শীতেও এক একবার চলে আসেন। বরফ পড়া দেখার শখ হলে খবরের কাগজে খবর দেখেই চলে আসেন। কাজেই তার ছুটি নেই, ফাঁকি দেবার উপায় নেই। নানা রকমের ফুল আর পাতার গাছে বাগান আলো হয়ে আছে। নানা জাতের বিগোনিয়ার মধ্যে ফ্লেমিং বিগোনিয়া আগুনের মতো জ্বলছে। শুধু ফুল নয়, পাতা আর ডালও আগুনের মতো লাল হয়ে আছে। আর এক দিকে সেই হলদে ফুলগুলো। কেটে কেটে ফুলদানি ভরে রাখলেও সহজে শুকোয় না। মালি বলে নার্গিস ফুল। বিলেতে এরই নাম কি নার্সিসাস? মনোহর নিশ্চয়ই বলতে পারবে।

পাহাড়ের গায়েও মালি নানা রকমের মরসুমি ফুল লাগিয়েছে। পিটুনিয়া নাস্টার্সিয়াম আর বুনো ভার্বিনা। ওরা লতিয়ে লতিয়ে পাহাড়ের গা ঢেকে ফেলেছে। আর অজস্র ফুল সাদা গোলাপী হলদে আর বেগ্‌নে। মাঝে মাঝে জংলী গোলাপ, তার লতানো ডালের মাথায় থোকা থোকা গোলাপী ফুল। গেট দিয়ে ঢোকবার সময় পাহাড়ের এই বাগানটাই সকলের আগে চোখে পড়ে। সুরুচির পরিচয়, তাতে সন্দেহ নেই।

মালতী ফুল তুলে ফুলদানি সাজিয়েছে, সোফার কভার বদলেছে, আর রেডিওগ্রামের জন্য রেকর্ড বেছেছে কয়েকখানা। বিকেল না হতেই শাড়ি বদল করে তৈরি হয়ে নিল। চোপরা সন্ধ্যের আগেই আসবে।

আড়ালে মিস্টার কাপুর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা কইছিলেন ঃ ও ছেলেটাকে অত আস্কারা কেন দিচ্ছ ?

কেন দিচ্ছি তা বুঝতে পার না ?

সন্দেহ করছি বলেই তো তোমাকে প্রশ্ন করছি।

মেয়ের বিয়ে তো দিতে হবে।

মিস্টার কাপুর চুরুট টানছিলেন, বললেন ঃ দেশে কি আর ছেলে নেই ?

পছন্দ মতো ছেলে কোথায় বল !

মিস্টার কাপুর ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন ঃ চোপরার ধারণা কি জান ?

না।

তার ছেলে নাকি মানুষ হয়ে ফেরেনি।

তোমাকে বলেছে ?

বলবে কেন, তার ধারনা আমি অনুমান করতে পারি।

মিসেস কাপুর এ কথা সমর্থন করলেন না, বললেন ঃ তোমার ভুল ধারণা।

হতে পারে। কিন্তু তার স্ত্রী যে খুব মুশড়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আমার মনে হয়, এ তার ছেলেকে দেখে।

মুসড়ে পড়ার মতো কিছু তুমি নিজে দেখেছ কি ?

সমালোচকের চোখ নিয়ে কিছু দেখিনি।

মিসেস কাপুর মেয়েকে লক্ষ্য করেছেন। বললেন ঃ নিজের মেয়েকে দেখছ ?

দেখছি।

তবে ?

তোমার নিজের যৌবনটা মনে পড়ে কি ? এই অবস্থায় আসতে তোমার কত সময় লেগেছে ?

তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমরা অতি সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়ে ছিলাম।

এখন অসাধারণ হলাম কিসে?

পয়সা আমাদের জাতে তুলেছে।

যখন আমরা সাধারণ ছিলাম, তখন এই জাতটা দেশে ছিল? না, এই জাতটা আমরা নিজেরাই গড়েছি?

তোমার কথা আজ দার্শনিকের মতো শোনাচ্ছে।

এই কয়েক বছরে অনেক দর্শন করেছি কিনা, তাইতেই এই পরিবর্তন হচ্ছে। বুঝতে পাচ্ছি যে মানুষের এটা অস্থায়ী জাত। যতদিন পয়সা, ততদিনই জাতে আছি। পয়সার গরম গেলেই নিজের জায়গায় নেমে যেতে হবে।

ঠাণ্ডা হবার ভয় কেন পাচ্ছ?

এই সরকার যতদিন আছে, ততদিন কোন ভয় পাইনে। দুর্বল যারা, তারা আমাদের ঘাঁটাবে না।

মালতী বাইরে পায়চারি করছিল। দিনের আলো নিবে গেছে। আস্তে আস্তে সমস্ত পাহাড় জুড়ে অন্ধকার নামবে। একটা একটা করে তারা উঠবার আগে বিজলির আলো জ্বলে উঠবে। জ্বলে উঠেছে। অন্ধকার ঘন হয়নি বলে আলো অস্পষ্ট আছে।

মালতীর মনে পড়ল আর একটা লোককে। চোপরাদের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে স্ক্যাণ্ডাল পয়েণ্টে দেখা হয়েছিল। তার নামটা মনে পড়ছে না, মনে পড়ছে তার অবজ্ঞাটা। মিস্টার কাপুর তার সঙ্গে হেসে কথা বলতে গিয়েছিলেন। সেও উত্তর দিয়েছিল হেসে। কিন্তু তার কথায় কী ধার! যেন ছুরি চালাচ্ছে। মিস্টার কাপুর বলেছিলেনঃ চোপরার বাড়িতে আপনাকে চিনতে পারিনি।

লোকটা হেসে বলেছিল: প্রচুর আলো ছিল বলে চিনতে অসুবিধে হয়েছিল। অন্ধকার গভীর হলে সহজে চিনতে পারবেন।

মানে ?

মানে চাঁদি শুধু উত্তাপ নয় আলোও দিচ্ছে, চোখ ধাঁধানো আলো। ঐ আলোতে মানুষ চিনতে অসুবিধে হয় বৈকি।

মিস্টার কাপুর আর কথা বাড়াননি। তাড়াতাড়ি এগোবার জন্য পা বাড়িয়ে বলেছিলেন: আবার দেখা হবে।

আজ্ঞে নিশ্চয়ই হবে।

খানিকটা এগিয়ে এসে মালতী জিজ্ঞাসা করেছিল: কে বাবা ?

একটা কেরাণী।

কেরাণী !

হ্যাঁ, ঐ রকমই কিছু। আমাদের বিল—টিল পাস করে।

মালতী ঐ লোকটার নামও শুনেছিল। একটু অদ্ভুত নাম। তাই মনে রাখতে পারেনি। মনে রাখবারও দরকার মনে করেনি।

আজ সন্ধ্যেবেলায় আকাশের দিকে চেয়ে ঐ লোকটার কথাগুলো তার মনে পড়ল। আকাশের একটা তারাও এখন দেখা যাচ্ছে না। জ্যোতির্ময়ের উজ্জ্বল আলোয় সব ঢাকা আছে। অন্ধকার না হলে বিদ্যুতের আলোও স্পষ্ট হয়ে উঠবে না। এ একটা সত্য কথা। প্রকৃতির দিকে তাকালে এমন সত্য অনেক ধরা পড়বে। কিন্তু ঐ লোকটা সমাজকে অবজ্ঞা করেছে। বলেছে, চাঁদির আলোয় মানুষ ঢাকা পড়েছে। মানুষ তো আলোতেই দেখা যায়। লোকটা নিশ্চয়ই সুস্থ নয়। মাথায় গোলমাল না থাকলে এমন কথা কেউ ভাবতে পারে না।

বেয়ারা এসে বারান্দার বাতি জ্বেলেছে। ঘরের বাতিও জ্বলেছে একটা একটা করে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে অসংখ্য বাতি জ্বলে উঠে মায়াময় হয়ে গেছে। সামনের সরু পথের উপর মালতী

টর্চের আলো দেখতে পেল। ওরা আসছে, বাবা মাকে সেই সংবাদ দিয়ে মালতী গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

মনোহরের গলা শোনা যাচ্ছে। একটা বিদেশী সুর গুণগুণ করতে করতে সে সকলের আগে নামছে। গেটের কাছে মালতীকে দেখতে পেয়েই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে মালতীর হাতটা চেপে ধরল গভীর ভাবে : হাই ইয়া?

কাপুর দম্পতী বেরিয়ে এসেছিলেন, বললেন : এস এস।

মনোহর তাঁদের সঙ্গেও করমর্দন করে তার দেরির কৈফিয়ৎ দিল। বলল : বাড়ি চিনলে আমি বিকেল বেলাতেই এসে যেতাম।

মালতী তার মালির কথা বলতে পারত। সে এসে বাড়ি চিনে গেছে। হয়তো সে এখনও ফেরেনি, হয়তো মনোহরের সে খেয়াল হয়নি। তাই কোন জবাব দিল না। বলল : আমারই দোষ হয়েছে, আমার সে কথা বোঝা উচিত ছিল।

মনোহর লজ্জায় যেন মরে গেল : ডোণ্ট মেনসেন ইট্—প্লিজ।

টর্চের আলোটা গেটের কাছে এসে নিবে গেল। মনে হল, একখানা কালো পাথর পাহাড় থেকে গড়িয়ে নামল। মিস্টার চোপরা কালো ডিনার স্যুট পরে এসেছেন। তাঁর পিছনে মিসেস চোপরা, পাশাপাশি দাঁড়াবার পর তাঁকে দেখা গেল।

আদর আপ্যায়ন শেষ হতে কিছু সময় লাগল। তারপর সবাই ভিতরে এলেন।

মিসেস চোপরা বললেন : আর কাউকে বলনি বুঝি!

মিসেস কাপুর বললেন : বলবার মতো আর কে আছে?

কেন, মন্ত্রী তো দেখলাম তোমাদের বিশেষ বন্ধু।

মিসেস কাপুর তাকালেন মিস্টার কাপুরের দিকে। তাই জবাবটা তিনি দিলেন স্ত্রীর হয়ে : ওদের কথা রেখে দিন। একষট্টি সালেই হাঁটুর উপর কাপড় তুলে হট হট করে ঘুরে বেড়াবে।

মালতীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে মনোহর হেসে উঠল। কিন্তু চোপরা দম্পতী হাসলেন না। তাঁরা ভেবেছিলেন মন্ত্রী মশায়ের সাক্ষাৎ এখানে পাবেন। তাতে আর কিছু না হোক, ছেলেটার একটা হিল্লে হবে। এ তো ধরাধরিরই যুগ।

মালতী মনোহরকে বলল : বসুন।

আফ্‌টার ইউ।

আমি আপনাদের নতুন কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করি।

বলে বেরিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পরে ফিরে এল একটা ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে।

মনোহর আর বসলনা, লাফিয়ে তার কাছে গিয়ে বলল : আসুন, আমি আপনাকে সাহায্য করি।

মালতী বলল : আমার বিদ্যের দৌড় বেশি নয়। এ জিনিষটা ভাল লাগল কিনা খেয়ে বলবেন। এর নাম পীচ ট্রী।

বলে কক্‌টেল শেকারে আধখানা নরম পীচ, এক চামচে লিমন জুস আর আধ চামচে চিনি দিয়ে পেগ দেড়েক ড্রাই জিন মেশাল। তার সঙ্গে ফ্রিজের মিনারেল। ভাল করে মেলবার পরে গেলাসে গেলাসে ছেঁকে ঢালল।

বুড়োরা অন্য গল্প শুরু করেছিলেন। মালতী তাদের পানীয় পরিবেশন করল। মনোহর এক গ্লাস হাতে নিয়েই বলল : এ জিনিষ যে ভাল হবে, তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই।

কেন ?

জিনের সঙ্গে লিমন, তার একটা অদ্ভুত আস্বাদ।

গেলাসে গেলাসে ঠেকিয়ে মালতী বলল : চিয়াস´।

মৃদু স্বরে মনোহর বলল : টু ইউ।

চুমুক দিয়েই মনোহর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল : ডিলিসাস!

মালতী এই উচ্ছ্বাসের কারণ খুঁজে পেলনা। তার মনে হল,

মনোহর ভদ্রতা করল। তা করুক, ভদ্রতার একটা দাম আছে। মালতী মনোহরের পাশে এসে বসল।

বাইরে অন্ধকার কত গভীর হয়েছে বোঝা যাচ্ছেনা, ঘরের ভিতরে সময়ের কোন হিসাব নেই। মিস্টার চোপরার আজ অনেক কিছু খেয়াল ছিলনা, মিসেস চোপরা তাঁকে বারে বারে সতর্ক করেছেন। তবু তাঁর সামর্থ্যের চেয়ে বেশি খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছেন। রাতের আহার শেষ করে তিনি সোফায় এসে গড়িয়ে পড়লেন। এর পরে শুধু এক পেয়ালা কফি, তার বেশি কিছু নয়।

মিস্টার কাপুর জানেন, চোপরার এ পুরনো অভ্যাস। চাকরির টাকায় আকণ্ঠ পান করা সম্ভব নয়। উটকো টাকা তখন নিয়মিত আসেনা। চোপরার তৃষ্ণা মিটত বন্ধুদের নিমন্ত্রণে। এ অভ্যাস বুঝি আজও তাঁর যায়নি। প্রকৃতি আর অভ্যাসে তফাৎ কতটুকু!

মিসেস চোপরাকে বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছে। অল্প অল্প কথা কইছেন মিসেস কাপুরের সঙ্গে।

খাবার ঘর থেকে মনোহর বসবার ঘরে আর ফিরলনা। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মালতীকে বলল: আমরাও কি বুড়ো হয়ে গেছি?

মালতীর চোখ চকচক করে উঠল।

মনোহর পিছন ফিরে বলল: এই বারান্দাটা তো বেশ।

দুজনে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে গেল।

টেবিলের উপর একটা টেপ রের্কডার দেখে মনোহর লাফিয়ে উঠল: এটার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

মালতী লজ্জিত ভাবে বলল: আমিও বলতে ভুলে গেছি। আপনাদের মালি এটা রেখে গেছে।

আমিইতো পাঠিয়েছিলাম। আমাদের বাড়িতে আপনাকে শোনাতে পারিনি, তখনও প্যাকিং খোলা হয়নি।

তৎপর ভাবে মনোহর ঢাকনা খুলে ফেলল। বলল : ও দেশের ভাল ভাল মিউজিক রেকর্ড করে এনেছি। কী শুনবেন? একখানা ফক্স ট্রট?

মালতীর চোখে অপরিসীম কৌতূহল। লোকটার সত্যিই প্রাণ আছে, জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলির সে অপব্যয় হতে দেবেনা। মালতী মাথা দুলিয়ে বলল : একটা শ্লো ফক্স্ ট্রট। আমার প্রিয় সুর।

মনোহর আর সময় নষ্ট করলনা। সমস্ত ঠিক ঠাক করে যন্ত্রটা বাজিয়ে দিল।

মনোহরের মনে পড়ল, এই বাজনাটা সে ব্ল্যাক পুলে রেকর্ড করেছে। সেদিন তার পাশে মালতী ছিলনা, ছিল মরীন। আশ্চর্য হয়ে সে বলেছিল, এ তোমার কোন্ কাজে লাগবে!

উত্তরে মনোহর হেসেছিল।

আজ আবার তার হাসি পেল। কাজে লাগল নাকি! সেই দিনটা আবার সে যে ফিরে পাচ্ছে! শুধু মরীনের বদলে আছে মালতী।

মনোহর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল। তার পায়ে ধীরে ধীরে তাল পড়ছে। মালতীর দিকে তাকিয়ে দেখল, তার চোখেও নেশা লেগেছে। ব্ল্যাক পুলের সমুদ্র বেলায় মরীনের চোখেও সে এমনই নেশা দেখেছিল।

মালতী কি এগিয়ে আসবেনা? তার নরম ডান হাতখানি ছোঁয়াবেনা মনোহরের বাম হাতে? তার ক্ষীণ কটি বেষ্টন করতে দেবেনা দক্ষিণ হাতে? মনোহরের মনে হল, মরীনে আর মালতীতে কোন প্রভেদ নেই। মালতীও এগিয়ে আসবে, যেমন মরীন এসেছিল। নিজে থেকে না এলেও ডাকলে নিশ্চয়ই আসবে। মনোহর তার বাম হাত শূন্যে তুলে মালতীর ডান হাতকে নিমন্ত্রণ জানাল।

মালতীর ভাল লাগছিল। শুধু সুর নয়, শুধু মনোহর নয়, ভাল লাগছিল এই জীবনের আস্বাদটুকু। নিজের অজ্ঞাতসারেই তার ডান হাত শূন্যে উঠল, মনোহরের হাতে লেগে স্থির হল।

মনোহর তার পা ফেলছিল নাচের তালে তালে। কয়েক পা এগিয়ে এসে মালতীর কোমরে তার ডান হাত রাখল। মালতী সরে গেলনা। যেমন করে মরীন একদিন কাছে সরে এসেছিল, মালতীও তেমনি করে এগিয়ে এল।

মালতী নাচতে জানে, দিল্লীর সমাজে অনেক নেচেছে। শুধু ফক্স্ ট্রট নয়, নাচের নামে দাপাদাপিও অনেক করেছে। চাচাচা মাম্বো স্যাম্বা রুম্বা, ট্যাঙ্গো আর রক অ্যাণ্ড রোল। জাইভিংও জানে। কিন্তু আজকের এই শ্লো ফক্স্ট্রটে কেমন নেশা ধরেছে। সিমলার শীতে বুঝি বিদেশের নেশা আছে। নিয়ন বাতিকে মনে হচ্ছে চাঁদের আলো। মালতী এগিয়ে এল।

মনোহর এবারে মালতীর উষ্ণ স্পর্শ পেয়েছে, উত্তাপ পাচ্ছে, নিঃশ্বাসের মতো সেই উত্তাপ দুলছে, উঠছে নামছে। মনোহর তার মাথা আর সোজা রাখলনা, ডান পাশে হেলিয়ে দিল। মালতীও তার মাথা নোয়াল দক্ষিণে। দুখানা মুখ এবারে পাশাপাশি দুলছে।

বসবার ঘরে বসে বুড়ো বুড়িরা কফি খাক। বারান্দার আধো আলো আধো অন্ধকারে মনোহর আর মালতী দেখুক নীল ড্যানিয়ুবের স্বপ্ন। নৃত্যের তালে তাদের গালে গালে ছোঁয়াছুঁয়ি হবে, মুখ সরিয়ে নেবার চেষ্টা কেউ করবেনা! পৃথিবীর কথা তারা ভুলে যাচ্ছে। দুরন্ত মনে হল সিমলার শীতার্ত সন্ধ্যা।

একুশ

স্মিতার মনে হল, কোথায় একটুখানি হিসাবের ভুল হয়ে গেছে। হয়তো সামান্য ভুল, কিন্তু তার পরিণাম এমন অনিবার্য হল। যে মনোহর তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য লক্কড় বাজার থেকে নেমে আসছিল ছোট সিমলায়, আজ কয়েকদিন তার কোন খবরই পাওয়া যাচ্ছেনা। তার সমস্ত আগ্রহ কি কয়েকটা দিনেই ফুরিয়ে গেল! কিন্তু কেন ফুরিয়ে যাবে!

প্রথম দিনেই স্মিতা এগিয়ে যেতে পারেনি। সত্য কথা। কিন্তু দীর্ঘদিনের সংস্কার যদি প্রথম দিনেই মুক্তি না দেয়, সে কি তার দোষ! এ দেশের ঋষি ও মনীষিরা প্রতিদিন ভাবের বোঝা বাড়িয়েছেন। সেই ভাব আজ ভার হয়ে দেশটাকে অলস করেছে। সভ্যতার দৌড়ে আজ কিছুতেই ছুটতে চাইছেনা। জড়তা যদি দেহের হয় তো চাবুক মেরে তাকে চালানো যায়। এ জড়তা যে মনে, সংস্কারের জড়তা। মনোহর কী করে আশা করে যে স্মিতা প্রথম দিনেই তার ডাকে সাড়া দেবে!

স্মিতা সাড়া দেয়নি, বরং বাধা দিয়েছে। সিনেমা হলে মনোহর বেশি এগিয়ে এসেছিল। এক বন্ধু আর এক বন্ধুর কাঁধে হাত রাখবে, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু সে পুরুষে পুরুষে, মেয়েতে মেয়েতে। পুরুষ এমন প্রকাশ্য ভাবে মেয়ের কাঁধে হাত রাখবে, এ দেশে এ বড় দৃষ্টি কটু।

স্মিতার তখনই মনে পড়ল তার অজ্ঞতার কথা। সে তার নিজের সমাজের মাপ কাঠি দিয়ে মনোহরের কাজের সমালোচনা করছে। যে সমাজটা সে দেখতে চাইছে, সেখানে হয়তো এ অতি সাধারণ

ঘটনা, এতে কারও কিছু মনে করবার নেই। মেয়েদের কোমর জড়িয়ে যারা নিয়মিত নাচছে, তারা এই আচরণকে রক্ষণশীল ভাববে। স্মিতার সন্দেহ হল, আপত্তি করারও বোধহয় কোন নির্দিষ্ট রীতি আছে। তার গলদ হয়েছে সেইখানে।

কদিন থেকে সনাতন গোস্বামী যেন বড় বেশি নাক গলাচ্ছে। হঠাৎ তার পরিবর্তনটা চোখে ঠেকে। স্মিতা এই আচরণের কোন যুক্তি খুঁজে পায়না। তার নিজের কোন স্বার্থপর অভিসন্ধি এখনও প্রকাশ হয়ে পড়েনি। জাখু পাহাড়ে পাঠাবার জন্য যে ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল, তাতে সনাতনের নিশ্চয়ই কোন স্বার্থ ছিল না। তারাদেবী সে নিজে গেছে, গেছে মিস্টার ও মিসেস সেনের সঙ্গী হয়ে। স্মিতার সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপনের কোন চেষ্টাই করেনি।

একটা কাজ সে করেছে। সুবিধা পেলেই সমাজকে আক্রমণ করেছে নির্দয়ভাবে। তাতে ব্যঙ্গের চেয়ে জ্বালা ছিল বেশি। কৌতুকের বদলে কটূক্তি, এ তার স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস। শুধু মিস্টার ও মিসেস সেন সম্বন্ধে কোন অশ্রদ্ধার কথা সে উচ্চারণ করেনি। মেরিনা হোটেলে তাদের পৌঁছে দিয়ে ছোট সিমলার পথেও কিছু বলেনি। বরং মনে হয়েছে যে ঐ তরুণ দম্পতীর জীবন যাত্রার রীতিতে তার সমর্থন আছে। হয়তো বা স্মিতাকেই সেই কথা বোঝাবার চেষ্টা ছিল। তাতে সনাতনের কী লাভ! মানুষ লাভ ছাড়াও কি কোন কাজ করে!

মিস্টার ও মিসেস সেনের কথাও স্মিতার মনে পড়ে। এ দুটি মানুষকে মনে হয় অন্য জগতের মানুষ। পৃথিবীর এই সমাজের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই, তাদের দুজনের যেন একটা স্বতন্ত্র সমাজ, সেই সমাজের তারা সর্বে সর্বা। তাদের শখ সাধ তাদের বিলাস ব্যসন—সবই তাদের দুজনের সংসার নিয়ে। সেখানে

তাদের গড়বার সাধনা অব্যাহত। স্মিতার খুব বিস্ময় বোধ হয়েছে। মানুষতো একটা নয়, মানুষ দুটো। তবু তাদের বিরোধ নেই কেন!

বিধায়কের কী হয়েছে! যে লোকটার পথ চলতে ক্লান্তি নেই এতটুকু, সে কি আজকাল ঘরে বসে সময় নষ্ট করছে! কিন্তু কেন আসেনা! অভিমান! কিসের জন্য অভিমান! মনোহরের সঙ্গে দুদিন মেলামেশা করলে কি তাকে অসম্মান করা হয়! কিন্তু মনোহর তো তা ভাবেনা। মনোহর নিশ্চয়ই জানে, বিধায়কের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট পরিচয় দীর্ঘদিনের। হৃদয় যদি উদার না হল, তো মানুষ নাম হল কেন!

বাহিরের বারান্দায় কারও পদধ্বনি শুনে স্মিতা চমকে উঠল। তার হাতের কাঁটা একেবারে স্থির হয়ে আছে, সোয়েটারের একটা ঘরও তোলা হয়নি। জানালা দিয়ে বেলা শেষের রৌদ্র আসছিল, কখন তা মিলিয়ে গেছে খেয়ালই করেনি। স্মিতা উঠে পড়ল, বাহিরে এল।

স্মিতা বিরক্ত হল। মনোহর নয়, বিধায়ক নয়, এসেছে সনাতন। এই লোকটার সম্বন্ধে তার বিরক্তি যেন দিনে দিনে বাড়ছে। নারদ দেবর্ষি কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে স্বর্গের দেবতাদের মনোভাবও বোধহয় এই রকম। সনাতন একটুও বিচলিত হলনা। বলল: আপনার কাছেই এলুম।

আমার কাছে?

স্মিতার বিস্ময়ের আর শেষ নেই।

নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করে সনাতন বসবার ঘরে এসে বসল। পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করে এক টিপ নস্যি নিল। তারপর বলল: চলুন একবার বিধায়কের কাছে।

স্মিতা এই গায়ে-পড়া ব্যবহার পছন্দ করেনা। সনাতনের

অভিসন্ধিতেও সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে। সংক্ষেপে উত্তর দিল : না।

তাহলে পল্টুর সঙ্গে যান।

আমি যাবনা বলেছি, আপনার সঙ্গে যাবনা এ কথা বলিনি।

আমার সঙ্গটাতো মধুর নয়, আর ইদানীং একটু সন্দেহ-জনকও মনে হচ্ছে। সেইজন্যে আমি নিজে থেকেই এ প্রস্তাব করেছি।

স্মিতা দাঁড়িয়েছিল, চমকে উঠল। এ লোকটা তার মনের কথা কী করে বলে! না, এ তার ধারণার কথা। সবাইকেই বোধহয় এই রকম বলে! নিজের চরিত্র তো তার অজানা নয়, বোকাও নয় মানুষটা। সনাতন আবার বলল : রাজী যখন হচ্ছেন না, তখন বসুন।

স্মিতা এই হুকুম করা অভ্যাসটা পছন্দ করেনা। বলল : মাকে ডেকে দিই?

সনাতন বলল : তাঁকে ডাকবার দরকার হবেনা। বাঁড়ুয্যে মশায়ের সঙ্গে পথে দেখা হয়েছে, প্রয়োজনীয় কথা থাকলে তাঁকেই বলতে পারতুম।

তবে পল্টুকে ডেকে দিই? সে রাস্তায় খেলছে।

সে বুদ্ধিমান ছেলে। কাল তাকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে যা দেখিয়েছি, তা আপনাকে বলেনি বলল। ভালই করেছে। আমি সত্য কথা বলি, কিন্তু নিন্দা করিনা। ভেবেছিলুম, কেলেঙ্কারির কথাটা সত্য হলেও নিন্দার পর্যায়ে পড়ে। ওটা আমার নিজের মুখে বলা উচিত হতনা। তাই পল্টুকে একটু স্ক্যাণ্ডাল পয়েণ্টে ঘুরিয়ে দিলাম। আমার বাড়ি তো ঐখানেই। অনেক স্ক্যাণ্ডালের খবরই পেয়ে যাই।

স্মিতা সনাতনের দিকে তাকিয়ে রইল।

সনাতন বলল ঃ কালকের গল্পটা পণ্টু আপনাকে বলেনি শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আমার দুর্বলতাটা ধরা পড়লনা।

কোথায় যেতে বলছিলেন ?

মনোহর চোপরা আপনার অপেক্ষায় বসে থাকলে বিধায়কের কাছে আমি যেতে বলতুম না। দুকূল যাওয়াটা কি ভাল ?

আমার ভালমন্দের ভার তো আপনার উপর দিয়ে রাখিনি !

একেবারে খাঁটি কথা। সাহস করে সে ভার যদি কেউ কোন দিন দেয়, আমাকে এমন দালালি করতে দেখতেন না। দারোগার মতো কোমরে দড়ি দিয়ে ধরে নিয়ে যেতাম।

স্মিতা জানে, কথায় সনাতনের সঙ্গে কেউ এঁটে উঠবেনা। একমাত্র পালিয়ে পরিত্রাণ। আর পালাবার পথ না থাকলে মৌনী থাকাই নিরাপদ। বলল ঃ আমি আসছি।

স্মিতা পাশের ঘর থেকে তার ক্লোকটা গায়ে দিয়ে এল। মাকেও জানিয়ে এল যে সে বেরচ্ছে।

পথে নেমে সনাতন সোজা চলতে লাগল।

স্মিতা বলল ঃ আপনি তো ফাগলি যাবেন বলছিলেন !

এই সোজা পথই ভাল। মনোহর চোপরা এখানে নেই, তবু আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন যে সে আপনার কাছে আসছিল না। বিধায়ককে বাড়িতে পাবেন জানি, তাই তার কথাটা বললুম না।

মিস্টার চোপরা কোথায় গেছেন ?

দয়া করে আমাকে সে কথা জিজ্ঞেস করবেন না।

কেন ?

আমি জানি, কিন্তু বলতে চাইনা।

আপনার কথা যে দেখছি—

ঠিক ধরেছেন। প্রাতঃস্মরণীয় হেরম্ব মৈত্রের মতো শোনাল।

কিন্তু তিনি তো সত্য কথা বলতেন।

আমিও বলি। কিন্তু আপনাকে বলতে আমার বাধা আছে। বাধা অন্য কোন কারণে নয়, শুধু দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। আপনাদের পৃথ্বিরাজকে আমি যদি সার্কাসের ক্লাউন বলি, আপনি দুঃখ পাবেন।

আপনার মন্তব্যের আমি খুব মূল্য দিইনা, আপনি নিশ্চিন্ত মনে বলুন।

শুনে সুখী হলাম। মানুষের চরিত্র এ যুগে দিনে দিনে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। তার প্রধান কারণ ব্যক্তিত্বের অভাব। পরের কথায় বেশি কান দিয়ে নিজের চরিত্রবল—

আপনি মিস্টার চোপরার কথা বলুন।

মালতী কাপুরের সঙ্গে মাশোব্রা গেছে।

বলে স্মিতার মুখের দিকে তাকাল।

স্মিতা বলল: এই সামান্য কথার জন্যে এত ভূমিকার কী দরকার ছিল?

এই প্রশ্নটা করেই আপনি জানিয়ে দিলেন যে ব্যাপারটা আপনি সামান্য ভাবছেননা। আমার মনে হয় যে সরাসরি সোজা প্রশ্ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে কৌতূহল প্রকাশ পেলেও কোন লুকোচুরির কথা মনে আসেনা।

স্মিতা এ কথার উত্তর দিলনা।

সনাতন বলল: মনোহর চোপরার সঙ্গে আপনার একটা বন্ধুতা হয়েছে বলে আপনি ভাবছেন। সেই লোক আপনাকে না জানিয়ে আর একটা মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে গেল। বললে আপনি যেতেন কিনা সে অন্য কথা। কেন বললনা তা নিয়ে আপনি ভাববেন। আরও ভাববেন মালতী কাপুরের কথা, কোন্ মেয়ে,

কতদিনের পরিচয়, এমন কি তাদের সঙ্গে আর কেউ গেল কিনা, এই সব কথা।

মালতী বোধহয় সেই কাপুর দম্পতির মেয়ে!

খুশী হলুম। এই রকম সোজা প্রশ্ন করলে আমার উত্তর দিতে সুবিধা হয়, আপনাকে বুদ্ধিমান ভাবতেও ইচ্ছে করে। দুর্বলতা থাকলেই তো ঢাকাঢাকির দরকার। আপনি দেখছি সাহস সঞ্চয় করেছেন। তাইতেই আপনার অনুমান মিথ্যে হয়নি।

তারপরের কথা বলুন।

বলব, আর আমার সঙ্কোচ নেই। মালতীকে নিয়ে মনোহর জীপে করে বেরিয়েছে। কয়েকদিন পরে ফিরবে। মাশোব্রা, নালদেরা তাতাপানি হয়ে চিনি বাংলোয় ফিরবে। সঙ্গে প্রচুর মদ আর টেপ রেকর্ডার গেছে। ভাল বাজনা হলে নাচও জমে।

খবর আপনি কোথায় সংগ্রহ করেন?

খবর সংগ্রহ করতে হয়না। চোখ মেলে চললে সবই দেখতে পাওয়া যায়।

স্মিতা বলল: আর একটু খুলে বলুন।

ভুলে যাচ্ছেন যে আমি স্ক্যাণ্ডাল পয়েন্টের ওপরে থাকি। কেলেঙ্কারির ঊর্ধ্বে না হলেও উপর তলায় যে থাকি, তা সত্য। তার একদিকে চোপরা, আর একদিকে কাপুর। জানালার ধারে বসে থাকলে সব স্ক্যাণ্ডালই দেখতে পাই।

সনাতনের কথার ধরনে স্মিতা হাসল।

সনাতন আর এক টিপ নস্যি নিয়ে বলল: এবারে খানিকটা সহজ হওয়া চলতে পারে।

আপনি কি এতক্ষণ সহজ ছিলেন না?

আপনার আড়ষ্টতার জন্যে একটু সতর্ক ছিলাম।

তাহলে আমাকে ভয় পান দেখছি।

আপনাকে না পেলেও আপনার কাজ কর্মকে পাই বৈকি। কিন্তু সে কথা থাক। মনোহর সম্বন্ধে আর কিছু জানবার থাকলে বলবেন। জীপটা আমাদের অফিসের লোকেরাই জোগাড় করে দিয়েছে কিনা, সমস্ত খবরই আমি আপনাকে দিতে পারব।

না, তার দরকার নেই।

দরকার না থাকলেই ভাল। না থাকাই উচিত। কিন্তু মন সব কথা মানেনা কিনা, তাকে বাগমানাতে একটা চরিত্রের দরকার। চরিত্র কথাটার আজকাল খারাপ মানে হয়েছে, অথচ অন্য কোন শব্দ নেই যে তার আসল মানেটা বোঝাতে পারি।

পাহাড়ের পথে তাড়াতাড়ি কথা বলা যায়না। বলতে হয় আস্তে আস্তে, রয়ে রয়ে। তা না বললেই হাঁফ ধরে। পথের খেয়াল করেনি বলেই অনেকটা পথ তারা পেরিয়ে এসেছে। মল রোড থেকে কার্ট রোড, এবারে তারা ফাগলির পথ ধরবে।

সনাতন বলল : এখন আপনি ফ্রক পরতে পারেন?

অদ্ভুত প্রশ্ন। স্মিতা আশ্চর্য হয়ে সনাতনের মুখের দিকে চাইল।

সনাতন বলল : কিছুদিন আগে আপনি নিশ্চয়ই ফ্রক পরতেন। এখনও অনেকে পরে। আপনার চেয়ে বয়সে যারা বড়, তারাও মাথার চুল ছেঁটে ফ্রক পরে ঘুরে বেড়ায়।

তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কী?

কেন, মানুষের সম্বন্ধ।

আমাদের কোন সংস্কার নেই?

সনাতন ফচ করে তার নাকটা ঝাড়ল। এক টুকরো নোংরা ন্যাকড়ায় নাক মুছে বলল : একটা সত্য কথা বলেছেন। আমাদের একটা সংস্কার আছে বলে সকলে যা করে আমরা তা পারিনে। এই কথাটি ভুলে গিয়ে যখন সব করতে যাই, তখন ভুল করি। দূরে

দাঁড়িয়ে সবাই মজা দেখে, হাসে, তামাসা করে। গোড়াতেই আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার।

স্মিতা বলল ঃ আপনি নীরবে পথ চলতে পারেন ?

সচরাচর চলিনা।

কেন ?

গল্পে ডুবে থাকলে পথশ্রম কম হয়।

আমার উল্টো। এক সঙ্গে দুটো কাজ আমি পারিনে।

এ কথাটা সত্য হলনা। পথ চলবার সময় আপনি বেশ ভাল গান গাইতে পারেন।

স্মিতার লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু উত্তর দিল সহজ ভাবে ঃ আপনি যদি একটু চুপ করে চলেন তো আমি যথার্থ আরাম পাই।

আর আমি যদি সঙ্গে না থাকি ?

তাহলেও ক্ষতি নেই।

তাহলে আমি একটু লাভ করি। ঐ তো বিধায়কের বাড়ি, আপনি এগোন।

আর আপনি ?

ঐ বাড়ির মেয়ের সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে।

বলে খানিকটা দূরের একটা বাড়ি দেখিয়ে দিল।

স্মিতা বলল ঃ কী বললেন আপনি ?

আমি ? বোধহয় লাভ করতে চেয়েছি। বাঙলা না ইংরেজী লাভ, বিধায়ককে খোঁজ নিতে বলবেন।

স্মিতা হেসে উঠবার আগেই সনাতন একটা ছোট গলি ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিধায়ক বাড়ি ছিল। আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ কার সঙ্গে এলে ?

গম্ভীরভাবে স্মিতা বলল ঃ তোমাদের সনাতন টেনে আনল।

সেকি, শরীর খারাপ বলে সনাতন যে আজ আগে ভাগে বাড়ি চলে গেল !

আমি কি তবে মিথ্যা বলছি!

বিধায়কের মনে হল, নিজের একটু লজ্জা ঢাকবার জন্যই স্মিতাকে এই ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। স্বেচ্ছায় তার কাছে এসেছে, এ কথা বুঝি বলা যায়না। বিধায়ক হেসে বলল: আমিই মিথ্যা বলেছি।

স্মিতাও হেসে বলল: তাই বল।

অনেকদিন পরে আজ তারা এক সঙ্গে হাসল।

বাইশ

সনাতনের বদনাম বাহিরে যত বাড়ছে, অফিসে তার সম্মান তত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ লোকটা সিমলায় আজ বেশি দিন আসেনি, কিন্তু এসেই সব কিছু প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। লোকে বলে, ভগবান তার চোখে ঠুলিটা পরিয়ে দিতে ভুলে গেছেন। সব জিনিসই সে সাদা চোখে দেখে, সাদা মনে বিচার করে, সমালোচনাও করে সাদা অর্থে। তার কথা যত সত্য, তত নিষ্ঠুর। কিন্তু মানুষটার মধ্যে কোন নিষ্ঠুরতা নেই। যারা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছে, তারা একটা অদ্ভুত ধারনা করতে শুরু করেছে। এই মানুষটার হৃদয়েও দস্তুর মতো একটা অদৃশ্য ধারা প্রবাহিত হয়, এত সঙ্গোপনে যে তা ধরা ছোঁয়ার বাহিরে। মানুষটার লোভ নেই, ক্ষোভ নেই, বেদনাবোধও নেই। যে অন্তঃ সলিলা ফল্গুর সন্ধান আজকাল পাওয়া যাচ্ছে, তা কোন বৃত্তির নয়। মনে হয়, মানুষের ধর্মের মূল কথাকে সে একটা বিন্দুতে সংহত করে রেখেছে। হীরের টুকরোর মতো তার উজ্জ্বল দ্যুতি, অসতর্কভাবে চলাফেরার সময় অতর্কিতে ঠিকরে পড়ে।

কালীবাড়ির সম্পাদক মশায় বললেন : একটা কথা বলব সনাতন?

সনাতন এক টিপ নস্যি নিচ্ছিল। থেমে গেল। বলল : আপনিও আমার অনুমতি নিয়ে কথা কইবেন?

ঘরে এ সময় কেউ নেই, অফিস সবে ছুটি হয়েছে, যে যার বাড়ি গেছে প্রয়োজনের জন্য। একে একে সবাই এসে জুটবে। তখন আর নিরিবিলি কথা বলা চলবেনা। তখন আড্ডা নয়, কাজ।

পুজোর কাজ। সকলেরই দায়িত্ব আছে। সসঙ্কোচে সম্পাদক মশায় উত্তর দিলেনঃ তোমাকে তো ভয় পাইনে, ভয় পাই তোমার মুখকে আমি বলছিলুম, এই অভ্যাসটি তোমার ছাড়। মনে যখন খাদ নেই, মুখে কেন জঞ্জাল বইবে?

হঠাৎ আজ এ কথা কেন বলছেন?

লোকে বলছে বলে।

আপনার নিজের কথা?

সম্পাদক মশায় একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। কেউ কোথাও নেই। আস্তে আস্তে উত্তর দিলেনঃ আমার কোন অভিযোগ নেই।

তারপরেই প্রশ্ন করলেনঃ অফিসে নাকি গোলমাল হচ্ছে?

কী রকম?

তোমার হাত দিয়ে শুনছি কিছুই পাস হচ্ছেনা।

আমার চালনিটা নতুন, মোটা জিনিস আটকে যায়।

শুনলুম সবই আটকাচ্ছে। কর্তারাও বিপদে পড়েছেন।

আজ্ঞে দোষটা আমার নয়। আমি সবিনয়ে নিবেদন করেছিলুম যে চালনির কাজটাই আমাকে দেবেন না। এখন দিয়ে ফেলে ভাবছেন, ছুঁচো গেলা হয়েছে। সরাতে দুর্নামের ভয়।

তার চেয়ে বেশি ভয়—

সে জানি।

এক তরুণ ভদ্রলোক এসেছিল দরজার কাছে। ফ্লানেলের পাৎলুনের উপর সোয়েটার, কাঁধে ওভারকোট। নমস্কার করে প্রশ্ন করলঃ আসতে পারি?

সম্পাদক মশায় বললেনঃ আসবেন বৈকি।

ভদ্রলোক ভিতরে এল।

সম্পাদক মশায় বললেনঃ বসুন।

তারপর তার দিকে চেয়ে রইলেন।

ভদ্রলোক বলল: আমি এখানেই উঠব ভেবেছিলুম। কিন্তু কলকাতা থেকে চিঠি দিয়ে কোন উত্তর পাইনি। বোধহয় আমার চিঠি পাননি, কিংবা সকলের চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়না।

সম্পাদক মশায় এ অভিযোগের উত্তর না দিয়ে বললেন: পুজোর সময় আমাদের খুব অসুবিধে। জায়গার বড় অভাব।

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বলল: এত বড় বাড়িতে স্থানাভাব?

সম্পাদক মশায় হেসে বললেন: দেখতেই বড়।

শহরের যে কোন স্থান থেকে দেখা যায়। নতুন কিছুও তৈরি হচ্ছে দেখলুম।

সম্পাদক আর কথা না বাড়িয়ে খাতায় মন দেবার চেষ্টা করলেন।

ভদ্রলোক বলল: এই কালীবাড়ি কতদিনের পুরনো?

উত্তর দিল সনাতন: ১৮২৩ সালে প্রতিষ্ঠা।

ভদ্রলোক বোধহয় মনে মনে বয়সের হিসেব করছিল। সনাতন বলল: হ্যাঁ, তা কিছু পুরনো বটে।

এই মূর্তি—

আট আনা খরচ করবেন?

ভদ্রলোক ফ্যালফ্যাল করে সনাতনের মুখের দিকে তাকাল।

সনাতন বলল: একখানা বই দেব। আপনার যত প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি, তা সবই ঐ বইএ আছে।

দেখি।

দেখি নয়, আমরা দোকানদার নই যে উঠে ঐ আলমারি থেকে একবার বার করব, আবার পছন্দ না হলে তুলে রাখব।

আমি দিচ্ছি।

বলে সম্পাদক মশায় উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাধা পেলেন

সনাতনের কাছে। বলল: বসুন আপনি। আমাকে কথা বলতে দিন।

ভয়ে ভয়ে সম্পাদক মশায় বসে পড়লেন।

সনাতন প্রশ্ন করল: দেশে ফিরে আপনি কি ভ্রমণ কাহিনী লিখবেন?

চেষ্টা করব।

তবে টুকে নিন। এই জায়গাটা আগে নেপাল রাজ্যে ছিল। গুর্খা যুদ্ধে ইংরেজের কাছে হেরে গিয়ে হাতছাড়া হয়েছে। পাতিয়ালার রাজা ইংরেজকে সাহায্য করে এই জায়গাটা বকশিস পেয়েছে। সাহেবদের সঙ্গে বাঙালীরা জরিপ করতে আসে। তারপর যা হয়, বিদেশে বাঙালী মানেই একটা কালীবাড়ি। চণ্ডীর বিগ্রহ দেখেছেন?

না।

এটি এক তান্ত্রিক সাধুর সম্পত্তি ছিল। বাঙালীরা উত্তরাধিকার পেয়েছে সেই তান্ত্রিক সাধুর মৃত্যুর পর। বইএ আর একটা গল্প পাবেন শ্যামলা দেবীর, যা থেকে এই পাহাড়ের নাম হল সিমলা। সাহেবরা যেটা জ্যাকু হিল বলে, আপনি লিখবেন যক্ষ পাহাড়। ঐ পাহাড়ে উঠবার পথে রথ্‌নে কাস্‌ল দেখবেন। সেইখানে এক কুঁড়ের ভেতর আর এক সাধুর সম্পত্তি ছিলেন শ্যামলা দেবী। এক সাহেব দেবীকে খাদে ফেলে দিয়ে বাড়ি তৈরি করলেন। কিন্তু রাতে ঘুমতে পারেন না। রোজ স্বপ্ন দেখেন লাল কাপড় পরা এক সেনা দলের, দেবীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে ছুটে আসছে। সেই দেবীকে খুঁজে বার করে এই কালীবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করে সাহেব রক্ষা পেলেন।

ভদ্রলোক পকেটে হাত দিয়েছিল। বোধহয় আট আনা পয়সা এবারে বার করবে। সনাতন বলল: এটুকু লিখে নিলে পয়সাটা

বেঁচে যাবে। কিন্তু যাদের চেষ্টায় ও পয়সায় সোয়া শো বছর ধরে আজকের এই কালীবাড়ি গড়ে উঠেছে, তাদের সম্বন্ধে যদি কিছু জানতে চান তো পয়সা খরচ করতেই হবে। অত নাম মনে রাখা সম্ভব নয়।

ভদ্রলোক কোন কথা না বলে একটি আধুলি বার করল। সনাতন সেটি সম্পাদকের সামনে দিয়ে আলমারি থেকে এক খণ্ড পুস্তিকা বার করে ভদ্রলোকের হাতে দিল।

আসি, নমস্কার।

বলে ভদ্রলোক অদৃশ্য হয়ে গেল।

সম্পাদক মশাই এবারে মুখ তুললেন। বললেন: আমি এই কথাই বলছিলুম সনাতন, তোমার মুখের ভয়ে একটা অপরিচিত লোকও পালিয়ে যায়।

আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি?

অপ্রিয় কথা বলেছ।

অপ্রয়োজনীয় কথা?

না বললেও চলত।

চলে সবই যায়, কিছুই আটকায়না। আটকালে পৃথিবীটার এমন অধঃপতন হতনা।

কিন্তু এই অধঃপাত রোধ করবার ভার তো তোমার ওপর কেউ দেয়নি সনাতন।

ভার দেবার আসল মালিক যে নিজের মন। যারা ভার নেয়, তারা এই মনের তাগিদেই নেয়।

সম্পাদক মশাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: তা সত্যি।

অকস্মাৎ মিস্টার কাপুরকে দরজার কাছে দেখা গেল। সম্পাদক মশাইকে তিনি চেনেন না, চেনেন সনাতনকে। বললেন: আরে মিস্টার গোসোয়ামী যে!

সনাতন তার নস্যির কৌটো বার করে বলল : আজ্ঞে।

মিস্টার কাপুরকে সম্পাদক মশাই বসতে বললেন।

মিস্টার কাপুর বললেন : কাজটা আগে সেরে নিই। তারপর গল্প।

বলে পকেট থেকে খান কয়েক নোট বার করে সম্পাদক মশায়ের হাতে দিলেন। বললেন : মায়ের প্রণামী।

সম্পাদক মশাই তাঁর চাঁদার খাতা আর রসিদের বই বার করলেন। সোফায় বসবার আগে মিস্টার কাপুরও তাঁর নামটা জানিয়ে দিলেন। বললেন : তারপর আপনার খবর কী বলুন।

বলে সনাতনের সঙ্গে গল্প শুরু করলেন।

গম্ভীরভাবে সনাতন বলল : আমি তো খবরের কাগজের রিপোর্টার নই।

আমি আপনার নিজের খবর জিজ্ঞাসা করছি।

ব্যক্তিগত কথার আলোচনা থাক।

মিস্টার কাপুর তার চুরুটের খাপ বার করে সম্পাদক মশায়ের দিকে বাড়ালেন। তিনি সনাতনের চোখের দিকে চেয়ে নিরস্ত হলেন। সনাতন বলল : ধন্যবাদ।

সম্পাদক মশাই নিলেন না বলে ধন্যবাদ দিল, না নিজে না নিয়ে ধন্যবাদ জানাল, সনাতনের মুখের দিকে তাকিয়ে তা বোঝা গেল না।

মিস্টার কাপুর বললেন : আজ একটু গরম বোধ হচ্ছে, তাই না।

সনাতন বলল : ওটা আবহাওয়ার গরম নয়।

মিস্টার কাপুরের মাথা কিন্তু খুবই ঠাণ্ডা। হেসে বললেন : আসুন না, একটু বাইরে হাঁটাহাঁটি করি।

সনাতনের উত্তরটা খুবই তিক্ত হবে বলে সম্পাদক মশাই

ভয় পেয়েছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি বললেন : যাও না, একটু ঘুরে এস।

সনাতন বলল : যাব বৈকি। ভদ্রলোক আমাদের গায়ে পড়ে এতগুলো টাকা চাঁদা দিলেন, আর তাঁর সঙ্গে একটু হাওয়া খেতে বাইরে যাবনা!

মিস্টার কাপুর তবু হাসলেন, বললেন : বাইরের খোলা হাওয়ায় মেজাজটা হাল্কা হবে।

বলে সনাতনের পিছনে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

মিস্টার কাপুর রিজের দিকে গেলেন না, পশ্চিমের রাস্তা ধরে নিচে নামতে লাগলেন। বড় রাস্তায় পৌঁছেও পশ্চিমে চললেন। সনাতন আপত্তি করল না।

এক সময় মিস্টার কাপুর বললেন : আপনার সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছি--

বাধা দিয়ে সনাতন বলল : আজ্ঞে আমার কথা থাক।

বিধায়ক উল্টো দিক থেকে আসছিল। বলল : একটু দাঁড়াবে সনাতন?

সনাতন রাস্তার ধারে সরে দাঁড়াল। মিস্টার কাপুর দাঁড়ালেন খানিকটা এগিয়ে।

বিধায়ক ভয়ে ভয়ে বলল : ও কার সঙ্গে যাচ্ছ সনাতন! মিস্টার কাপুর তো ওরই নাম।

সনাতন বলল : জানি।

কিন্তু ওর কর্মচারীরা যে শাসিয়ে গেছে, তা বোধহয় জাননা। ওদের এস্টিমেট তুমি পাস করনি।

তাতে হয়েছে কী?

বিধায়ক আরও আস্তে বলল : ওদের অসাধ্য কাজ নেই।

সনাতন হেসে বলল : তুমি নিশ্চিন্তে ছোট সিমলায় যাও।

তোমার সঙ্গে যাব ?

না।

বিধায়ক ক্ষোভের সঙ্গে বলে গেল ঃ যা খুশি, তাই কর।

মিস্টার কাপুর বললেন ঃ ও ভদ্রলোক কে ?

আমার বন্ধু।

আর কোন পরিচয় নেই ?

আমাদের আবার পরিচয় !

মিস্টার কাপুর অনেকক্ষণ কথা কইলেন না।

নিজের বাড়ির বারান্দায় উঠে বললেন ঃ এই আমার গরিবখানা।

দৌলতখানা বলুন।

আপনি ভাল উর্দু জানেন দেখছি।

সনাতন বাধা দিয়ে বলল ঃ অনুগ্রহ করে আমার সম্বন্ধে কিছু কইবেন না।

মিসেস কাপুর বেরিয়ে এসেছিলেন। সনাতনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সনাতনের স্বাস্থ্য ভাল। দীর্ঘ ঋজু দেহে আভিজাত্যের আভাস আছে। গলাবন্ধ পট্টুর কোটে গোলামির বিজ্ঞাপন নেই। উত্তর স্বাধীনতা যুগে খদ্দরের মতো সম্মানের হয়েছে। মিসেস কাপুর তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। কাজেই সনাতনকে তার নস্যির কৌটো বার করতে হল। ঐ কালো গুঁড়ো নাকে গুঁজবার সময় সভ্যতাকে বেশ উপহাস করা যায়।

মিসেস কাপুর করুণভাবে তার নাকে নস্যি নেওয়া দেখলেন, তারপরে বেয়ারাকে ডেকে চায়ের ফরমায়েশ করলেন।

বাহিরে হঠাৎ পদধ্বনি শোনা গেল! একজনের নয়, দুজনের। মিস্টার কাপুর বাহিরে গিয়েই আশ্চর্য হলেন: তোমরা!

উত্তর শুনে সনাতন বুঝল, মনোহর চোপরা ফিরেছে। মনোহর বলল: মালতীর জন্যে ফিরে এলাম।

মিসেস কাপুর বেরিয়ে এলেন, পিছনে সনাতন। মালতী খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। বড় ক্লান্ত রুক্ষ চেহারা। মনে হল, অনেক দিনের গ্লানি বহন করে ফিরছে। মিসেস কাপুর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মেয়েকে ধরলেন: কী হয়েছে?

কিচ্ছু না।

ঘরের ভিতরে যাবার সময় সনাতনকে মালতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে গেল।

পাহাড়ী ড্রাইভার তার স্যুটকেশ আর হোল্ডঅলটা এনে বারান্দায় রাখল। সনাতন তাকে ডেকে বলল: আমি যাব রে, আমাকে নিয়ে যাস।

আচ্ছা হুজুর!

সনাতন এবারে মনোহরকে জিজ্ঞাসা করল: আপনি এখন বসবেন না নিশ্চয়ই।

না।

তবে চলে আসুন।

মিস্টার কাপুরকে বলল: আজ আসি।

মিস্টার কাপুর কোন উত্তর দিলেন না। মনে হল, তিনি মাটির দিকে চেয়ে তাঁর মুখ লুকোবার চেষ্টা করছেন।

জীপে উঠে সনাতন বলল: স্মিতা আপনার খোঁজ করছিল

ইণ্টারেস্টিং!

বলছিল, আপনার সঙ্গে একদিন প্রস্পেক্ট হিলে যাবে।

ভেরি স্পোর্টিং অফ হার। উই মাইট ডু ইট টুমরো।

সনাতন বলল : হেঁটে যাতায়াতে কষ্ট হবে, এই জীপটাই নিয়ে যাবেন।

সনাতনের কাঁধে একটা চাপ দিয়ে মনোহর কৃতজ্ঞতা জানাল : থ্যাঙ্কস এ লট—টা।

কালী বাড়ির নিচে দিয়ে যাবার সময় হাসতে হাসতে সনাতন নেমে গেল। মনে হল, অনেক দিনের অনেক আশা তার পূর্ণ হতে চলেছে।

তেইশ

মনোহর সেই জাতের পুরুষ যারা যৌবনকে ভাবে ভোগের জিনিস আর জীবন উপভোগের। তার সংস্কার নেই, সমাজ তার অন্তরায় নয়, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তাকে ভয় দেখায় না। কয়েকটা দিন পাহাড়ে বনে দুরন্ত ভাবে ঘুরে এসেও তার তৃপ্তি আসে নি, ক্লান্তও হয় নি এতটুকু। একটা রাতের বিশ্রামেই আবার নূতন জীবন ফিরে পেল। সকাল বেলায় মালতীর খবর নিয়ে এল, বিকেল বেলায় গেল ছোট সিমলায়।

হরিহরবাবু ভেবেছিলেন যে তাঁর দুর্বলতা তিনি ঝেড়ে ফেলেছিলেন। আকাশের দিকে আর তিনি তাকাবেন না, আকাশের ধূমকেতুর দিকে। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। সরোজিনী এসে অভিযোগ করলেন: এ তুমি কী করলে?

তাইতো! মনোহরের সঙ্গে স্মিতাকে কেন একা ছেড়ে দিলেন! ঐ লোকটাকে নিয়েই তো গোলমালের শুরু হয়েছিল। সে যদি কোন রকমে মিটল তো আবার কেন বেহায়াপনা!

স্মিতারই বা কী রকম আক্কেল! লাজ লজ্জা ভয়, কোন কিছুই কি তার শরীরে নেই! সেদিন বিধায়কের বাড়ি থেকে একটু বেশি রাতে ফিরেছিল। বিধায়ক নিজে এসে পৌঁছে দিয়ে গেছে। বাবা মা দুজনেই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু বিধায়ককে সঙ্গে দেখে খুশী হয়েছিলেন বেশি। সেই মেয়ে আজ মনোহরের সঙ্গে বেরিয়ে গেল!

জীপে বসে স্মিতা ভাবছে অন্য কথা। এই মানুষটার আকর্ষণ আছে কোনখানে! দামাল ছেলের মতো ছুটে এসে সমস্ত ভাবনা

চিন্তা ওলট পালট করে দিল। যা আর কখনও করবে না বলে মন স্থির করেছিল, মনোহর তার সে সংকল্প নিমেষে ভেঙে দিল! তার মন এত হাল্কা, না মনোহরের শক্তির শেষ নেই!

এ পেনি ফর ইওর থট্। কী ভাবছ?

স্মিতা হিন্দীতে বলল: আপনার কাণ্ড দেখছি।

আপনার নয়, তোমার বল।

স্মিতা দেখল, লোকটা বড় তাড়াতাড়ি এগোতে চায়। তাই তার কথার কোন উত্তর দিলনা।

মনোহর বলল: প্রস্পেক্ট হিল বুঝি তোমার খুব ভাল লাগে।

অনেকদিন যাইনি।

কবে সেই ছেলেবেলায় গিয়েছিলাম, আমিও ভুলে গেছি। পাহাড়ের ওপর একটা মন্দির দেখেছিলাম কি?

কামনা দেবীর মন্দির।

কামনা দেবী। বেশ নামটি তো। কামনা মানে তো শুনেছি—

স্মিতা তাড়াতাড়ি বলল: ঠিকই শুনেছেন।

কামনা শব্দটা তত শ্লীল নয়, ব্যবহারের গুণে অশ্লীল হতে পারেনি। সেদিন তারাদেবীর প্রাঙ্গণে মায়া তাকে বুঝিয়েছিল।

সিমলায় যে পাহাড়ের শ্রেণী, তার এক একটা চূড়োর এক একটা নাম। জাখু হিলের পরে যে চূড়োটা, সেটা উঁচু নয় বলে তার নাম নেই। মালভূমির মতো সেই জায়গাটায় গ্র্যাণ্ড হোটেল আর কালী বাড়ি। তার পরের চূড়োটার নাম সামার হিল, তারই উপর রাষ্ট্রপতি ভবন। অনুমতি নিয়ে ভিতরটা দেখা যায়। প্রস্পেক্ট হিল তার পরের চূড়ো। বাঁধানো রাস্তায় অনেকখানি নির্জন পথ পেরিয়ে তারা লোকালয়ের ভিতরে এল। সেই লোকালয় পেরিয়ে পাহাড়ের পাদদেশ। গাড়ি নিচে রেখে পায়ে হেঁটে পাহাড়ে ওঠা। সিমলায় বেড়াতে এসে লোকে পায়ে হেঁটেই এখানে

আসে। পায়ে হেঁটেই ফিরে যায়। বেড়ানোর আনন্দ তাতে সম্পূর্ণ হয়।

তখনও সূর্যাস্ত হয়নি। স্মিতা বলল: এই পাহাড়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুইই মনোরম।

মনোহর বলল: সূর্যাস্ত দেখেছি—সুইডেনের—

মনোহর কিছু মনে করবার চেষ্টা করল।

স্মিতা বলল: আজ আমরা এই পাহাড়ে সূর্যাস্ত দেখব।

মনোহর সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিল: আর ফিরব সূর্যোদয় দেখে। উড ইউ লাইক ইট?

ও নো, নট টু নাইট।

স্মিতার হঠাৎ কয়েক দিন আগের ঘটনা মনে পড়ল। বিধায়কের সঙ্গে সে জাখু পাহাড়ে উঠেছিল সূর্যোদয়ের সময়। ভাল লেগেছিল সেই সকালটি। ভাল লেগেছিল বিধায়ককেও। কিন্তু সে বড় ভাল মানুষ। নিজের দাবী জানাতে পারেনি, ভয় পেয়েছিল অধিকারের কথা বলতে। মনোহরের সঙ্গে তার আকাশ পাতাল তফাৎ। এ লোকটা সারাক্ষণই দাবীর কথা ভাবছে। এক রকম জোর করেই তাকে টেনে নিয়ে এল। বেরিয়ে আসবার সময় স্মিতার ভয় করেছিল। লোকটা বড় বেপরোয়া। কিন্তু কতদূর বেপরোয়া, স্মিতার তা জানতে হবে। একটা সমাজকে নাকোচ করে দেবার আগে তার শক্তি ও দুর্বলতা দুইই জানা দরকার। মনোহর একটা নূতন সমাজের লোক। তার শক্তির পরিচয় সে পেয়েছে, পায়নি দুর্বলতার সংবাদ। স্মিতা আজ সাহস করে বেরিয়ে এসেছে। সাহসে ভর করেই মনোহরকে সঙ্গ দেবে। মনোহরও তো মানুষ।

দুজনে পাহাড়ে উঠছে। মনোহরের হাতে বেতের টুকরি আর কাঁধে কাপড়ের ঝোলা। স্মিতা বলল: একটা আমায় দিন।

মনোহর কিছু ভাবছিল, অন্যমনস্কভাবে বলল : নেভার মাইণ্ড।

কিন্তু বোঝা এগিয়ে দিলনা।

স্মিতা বলল : কী আছে ওতে ?

তৃষ্ণার জিনিস।

মনোহরের তৃষ্ণার কথা স্মিতা জানে। কিন্তু ওতে তো তৃষ্ণা মেটেনা, তৃষ্ণা ওতেই বাড়ে। মানুষ পাগল হয়। কামনা দেবীর মন্দিরে কি মনোহরও আজ পাগল হবে! স্মিতা তার চারদিকে চেয়ে দেখল। অপরাহ্ণের আলোয় নির্জনতার ভয় নেই। কিন্তু এই আলো সারাক্ষণ থাকবে না। আর একটু পরেই কনে দেখা আলো ঝলমল করে উঠবে। মন রাঙাবে, পৃথিবী হবে রঙীন। কিন্তু তারপর ?

তারপর পূর্বের দিগন্ত থেকে বন্যার জলের মতো অন্ধকারের বন্যা নামবে। কোন শব্দ নেই, চীৎকার হাহাকার নেই। একেবারে নিঃশব্দে এত বড় পৃথিবীকে গ্রাস করবে কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে। তখন মনোহর কী করবে ?

স্মিতা একটা হোঁচট খেল। পাহাড়ের পথে একখণ্ড পাথর পড়ে ছিল বেয়াড়া ভাবে। তাতে তার পা পড়েছিল অসাবধানে। কিন্তু কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। মনোহরের বাঁ হাতটা খালি ছিল, সেই হাতে স্মিতাকে জড়িয়ে ধরে তাকে পড়তে দিল না। স্মিতার দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠল, কিন্তু সেই বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারল না।

মনোহর শিস দিচ্ছে। একটা বিদেশী সুর। আজ স্মিতা তার পাশে এসেছে।

খানিকটা উপরে জন কয়েক স্ত্রী পুরুষ দেখা গেল। সূর্যাস্ত দেখতে তারাও এসেছে। ওদের দিকে তাকিয়ে স্মিতার খুব ভাল লাগল। ওদের প্রাণ আছে, রস জ্ঞান আছে, জীবনকে ওরাও উপভোগ

করবে। কিন্তু মনোহরের মুখের দিকে চেয়ে তার অন্য কথা মনে হল। সে আর শিস দিচ্ছেনা, তার পা পড়ছে না তালে তালে। পথের ধারে সে কিছু খুঁজছে মনে হল।

স্মিতা বলল: কী দেখছেন?

একটা মনের মতো জায়গা।

স্মিতা বুঝেও যেন বুঝল না।

মনোহর বলল: ভিড় আমার ভাল লাগে না।

স্মিতার মনে হল, বিধায়কের সঙ্গে জাকু পাহাড়ে উঠবার সময় তারও এই কথা মনে হয়েছিল। সেখানে তার ভয় ছিল না, ভাবনাও না। বিধায়ক নামে যে পুরুষটা তার সঙ্গে ছিল, প্রশ্রয় না দিলে সে তার পৌরুষ প্রকাশ করবে না। সে সাহস তার নেই। সেদিনের মতো নিশ্চিন্ত মনে আজ সে পথ চলতে পারছে না।

তবু তারা উপরে উঠল। মন্দিরের ভিতর কামনা দেবীর মূর্তি দেখল দু চোখ ভরে। তারপর ঘুরে এসে সেই প্রশস্ত জায়গার উপর দাঁড়াল। এখানে কোন দিকে দৃষ্টি অবরুদ্ধ নয়। পূর্বে এই পাহাড়েরই অপর প্রান্তে জাখুর শীর্ষ ও ছোট সিমলা দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমের পাহাড় স্তরে স্তরে নেমে গিয়ে সমতলে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণে এই পর্বতেরই বিস্তার। স্মিতারা এই দিকেই গিয়েছিল তারা দেবী দর্শনে। উত্তরে নাকি কৈলাসের দর্শন মেলে স্বচ্ছ আবহাওয়ায়। স্মিতা বলল: আসুন, এইখানে আমরা বসি।

মনোহরের এ স্থান পছন্দ হলনা। বলল: এইখানে!

স্মিতা বলল: মন্দ কি।

মনোহর ধৈর্য হারাচ্ছে, বলল: ওন্ট্ ইউ ওয়েক আপ এ বিট?

উত্তরে স্মিতা খিলখিল করে হেসে উঠল: পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়বার জন্যে তো আমরা আসিনি।

মনোহরও হাসল। একেবারে শব্দহীন নিঃশব্দ হাসি। কিন্তু

স্মিতার সমস্ত মন কেঁপে উঠেছে। তার মনে হল, মনোহর তার ভয় সঙ্কোচ লজ্জাকে যেন উপহাস করল কোন মৌন মন্তব্যে। স্মিতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল : তবে কোথায় বসবেন ?

কামনা দেবীর মন্দিরের দিক থেকে কয়েক জন স্ত্রীপুরুষ এ দিকে আসছিলেন। তাদের দেখতে পেয়ে মনোহর বলল : চল না, খুঁজে দেখি।

বলে নিচের দিকে নামতে লাগল।

উপরের মতো বসবার জায়গা নেই। তবে অসমতল অনাদৃত স্থান অনেক আছে। এমনই একটি অপরিচ্ছন্ন স্থানে পৌঁছে মনোহর চারিধারে চেয়ে দেখল। একটু দূর, একটু অন্ধকার। জায়গাটা তার পছন্দ হল। বলল : ইট্‌স্ লাভ্‌লি হিয়ার।

বেতের টুকরি আর কাপড়ের ঝোলা দুইই নামিয়ে রাখল।

স্মিতা ভেবেছিল, মনোহর তার হাত ধরে তাকে পাশে টেনে নেবে। তাই নিজেই তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। মনোহর নিজেও বসল, বলল : কেমন লাগছে ?

স্মিতা শুধু হাসল।

বেতের টুকরিতে আছে নানা জাতের পানীয়। আর ঝোলায় খাবার। সুন্দর দুটো গেলাস বার করে মনোহর বলল : কী খাবে ? জিন অ্যাণ্ড লাইম ? না আর কিছু ?

আমি জানিনে।

মনোহর হাসল। বলল : একটা ভাল জিনিসও সঙ্গে এনেছি। সকাল বেলায় অনেক চেষ্টা করে জোগাড় করেছি।

সে কী জিনিস, স্মিতা তা জানতে চাইল না। গেলাসটা হাতে নিতে হল। মনোহরের অনুরোধ আদেশের মতো মনে হয়েছিল। গেলাসে গেলাসে ঠেকিয়ে মনোহর বলল : টু ইউ, সুইটি-পাই।

স্মিতার গলা তখন শুকিয়ে উঠছে। তৃষ্ণায় নয়, ভাবনায়। স্মিতা তাকে লক্কড় বাজারের বাড়িতে মদ খেতে দেখেছে। মনোহর নির্বিকার ভাবে জলের মতো মদ খায়। এক সঙ্গে এত জল স্মিতা খেতে পারবেনা।

পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবে গেছে। পূর্ণিমা হলে একই সঙ্গে চন্দ্রোদয় হত। এই পাহাড়ের উপর ঢল নামত স্বচ্ছ জ্যোৎস্নার। মনোহরের চোখে আবেশ লেগেছে। বলল : এখনও তুমি দূরে থাকবে ?

স্মিতা উত্তর দিল না, সরেও এল না কাছে।

বাম হাতটা স্মিতার দিকে বাড়িয়ে মনোহর বলল : প্লীজ !

কী লজ্জা ! কাঁধের উপর মনোহরের হাতখানা বড় ভারি ঠেকছে। বুক কাঁপছে দুর দুর করে।

মনোহর জোর করে তাকে কাছে টানতে পারত, কিন্তু স্মিতার অনেক দিনের লজ্জাকে সে এক মুহূর্তে ভেঙ্গে দিতে চায় না। লজ্জা তার অল্প অল্প করে যাক, আস্তে আস্তে সে কাছে আসুক। একটা একটা করে আকাশে তারা উঠবে, চাঁদের আলো হবে রূপোর মতো পরিচ্ছন্ন। এই মেয়েটাও ধীরে ধীরে মোহিনী হয়ে উঠবে, মাশোব্রায় মালতীর মতো। মনোহর বলল : সেদিন তুমি ফাঁকি দিয়েছিলে স্মিতা, আজ একটা গান শোনাও।

মনোহরের অশান্ত বাম হাতটা স্মিতা নিজের হাতে ধরে রেখেছিল। বলল : আজ থাক।

কেন থাকবে ? হ্যাভ্ এ শ্যাম্পেন টু পেপ আপ।

ঢক ঢক করে নিজেই খানিকটা মদ গিলল। বলল : আর কত ভাববে ?

মনোহরের আকর্ষণ তখন প্রবলতর হয়েছে। ছু হাতে তাকে বুকের উপর টেনে আনল। বলল : গিভ মি এ স্মাইল।

স্মাইল! স্মিতা হাসতে পারলনা, হাসি তার শুকিয়ে গেছে। দুরন্ত ভয় উঠছে বুকের ভিতর থেকে ঠেলে। স্মিতা নিজেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করল। মালতীর কথা তার সহসা মনে এসেছে। তাকেও কি মনোহর এমনি করে চেয়েছিল? কী করেছিল মালতী?

মনোহরের বাঁধন আলগা হয়ে গিয়েছিল। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল : ইউ আর টু গুড টু বি ট্রু।

সোজা হয়ে বসে স্মিতা কথা বলল। আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল : মালতীকে কেমন লেগেছে?

কেমন! ওয়েল—উই হ্যাড সাম গুড ফান। ছাট্স অল।

মনোহর এ কী বলছে! শুধু ফান, শুধু খেলা! আর কিছু নয়! তবু প্রশ্ন করল : মালতীকে আপনি বিয়ে করবেন না?

হোয়াট!

এবারে স্মিতার ঘৃণা হচ্ছে। ইচ্ছে হল, মনোহরকে ঠেলে ফেলে দেয়। পাহাড়ের গা বেয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে যাক। এমন মানুষের গড়িয়ে যাওয়াই উচিত। কিন্তু স্মিতা তাকে ধাক্কা দিতে পারলনা। সরে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল : চলুন এবারে।

এখনি!

এখনি বৈকি।

মনোহরও উঠে দাঁড়াল। বলল : চল।

মনোহর ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আজকের সন্ধ্যেটা তার মাটি হল।

অন্ধকার পথে নামতে নামতে মনোহর বলল : হাউ অ্যাবাউট এ ডেট স্মিতা?

মনোহর আবার মনোহরের মতো কথা কইছে। স্মিতা অন্ধকারেও তার চকচকে চোখ দেখতে পাচ্ছে। আবার সেই দৃষ্টি! স্মিতা এই দৃষ্টিতে একটা আদিম প্রবৃত্তি দেখছে, দেখছে একটা দুরন্ত শক্তি। ভয়ে ভয়ে সে তার সামনে ও পিছনে চেয়ে দেখল। না, কেউ কোথাও নেই। কেউ তাদের দেখতে পাচ্ছেনা। কেউ তাকে রক্ষা করতে আসবেনা। মনোহরকে মাতাল দেখে স্মিতা যে সাহস সঞ্চয় করেছিল, সে সাহস তার এক নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল। স্মিতার বুক আবার দুরদুর করে কেঁপে উঠল। বলল ঃ উই উইল সি।

মনোহর দাঁড়িয়ে বলল ঃ পিছিয়ে কেন পড়ছ ?

বলে তার হাত বাড়াল স্মিতার দিকে। স্মিতা ধরা দিলনা। তার পাশ কাটিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেল।

পাহাড়ের উপর থেকে স্মিতা আজ সিমলার শহরটা দেখেছে। তারার মতো অগনিত বাতিতে সমস্ত পাহাড়টা ঝকঝক করছে। বাতির শেষ নেই, যেমন শেষ নেই আকাশের তারার। কিন্তু সিমলার আলো আকাশের মতো নিরাপদ নয়। মাঝখানে গভীর খাদ আছে অন্ধকারময়। অসংখ্য খাদ। ঐ খাদ সোজা পথে অতিক্রম করে আলোর কাছে পৌঁছান যায় না। কেউই ঐ আলোর কাছে পৌঁছায় না। ও তো আলো নয়; আলেয়া, মৃগতৃষ্ণিকা।

স্মিতার মনে হল, এ সবের চেয়ে মাটির পৃথিবী ভাল। সমতল পৃথিবী। ধূলি ধূসর রুক্ষ কঠিন হলেও নিশ্চিন্ত নিরাপদ। মাথার উপরে উদার আকাশ আছে। সেই আকাশ থেকে নক্ষত্রের আলো আসে দেবতার আশীর্বাদের মতো। স্মিতা বড় তাড়াতাড়ি নামছে। মাটির স্পর্শের জন্য মন তার ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মনোহর! ঐ বেহায়া লোকটা যে তাকে অনুসরণ করছে। জোর করে তাকে জীপে তুলবে, তার পরে অদৃশ্য হয়ে যাবে আর এক

অন্ধকারের রাজ্যে। না না, মনোহরের সঙ্গে সে আর কিছুতেই যেতে পারবে না। কী আশ্চর্য তার ধারণা—শুধু ফান, শুধু খেলা। জীবনের এত বড় একটা সম্পদ তার কাছে শুধু কৌতুকের জিনিস! হৃদয়টা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দেহ থেকে। ছিছি, হৃদয়হীন দেহ নিয়ে এরা ঘুরে বেড়ায়!

স্মিতা স্বেদাক্ত হচ্ছে, শুধু শ্রমে ও ঘৃণায় নয়, ভয় ও ভাবনায়। মনোহরের কাছ থেকে তাকে আত্মরক্ষা করতে হবে। তার সঙ্গে এক গাড়িতে পাশাপাশি বসে কিছুতেই ফিরতে পারবে না। মনোহরকে আর মানুষ ভাবতে পারছে না।

মনোহর পথে দাঁড়িয়ে তার পাইপ ধরিয়ে ছিল। এবারে পিছন থেকে বলে উঠল: অত ছুটছ কেন?

স্মিতা কোন উত্তর দিতে পারল না। সে অন্য কথা ভাবছে। পাহাড়ের পাদদেশে তাদের ছাড়াছাড়ি হওয়া দরকার। অথচ এ কথা বলা যায়না। সৌজন্যে বাধে। সভ্যতারও বাধা আছে। স্মিতা কী করবে, কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেনা।

স্মিতা হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে দেখল, তাদের জীপের পাশে একজন ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে পায়চারি করছেন। মানুষটার ধরন যেন চেনা চেনা। কোথায় যেন তাকে দেখেছে। এক দিন দু দিন নয়, অনেক দিন অনেক জায়গায়। আর একটু কাছে এসে স্মিতা চেঁচিয়ে উঠল: বিধায়ক!

বিধায়কের কাছে স্মিতা হেঁটে এলনা, ছুটে এল: তুমি এখানে?

একেবারে বুকের কাছে এসে বিধায়কের হাত দুখানা শক্ত করে চেপে ধরল।

বিধায়কের বিস্ময়ের যেন শেষ নেই। বলল: সনাতন কোথায়?

সনাতনবাবু!

আমি তো তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

মনোহর এগিয়ে এল। স্মিতা তখন খুশিতে ঝলমল করছে। বলল : বিধায়ককে চেনেন না বুঝি !

বিধায়ক আর মনোহর মুখোমুখি দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু স্মিতা বিধায়ককে দাঁড়াতে দিলনা। বলল : চল বিধায়ক।

পথে আর অন্ধকার নেই : সিমলার সমতল পথে স্মিতা খুশিতে উচ্ছল হল :

শুধু গান কেন, শুধু প্রাণ কেন,

তুমি সব নাও।

মনোহর অভিভূতের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা ভেংচি কেটে জীপে উঠল : ও, হোয়াট দি হেল !

এইটাই পৃথিবীর শেষ সন্ধ্যা নয়।

চব্বিশ

সকালবেলায় সনাতন গোস্বামী পূজায় বসেছিল। ছোট একখানি ঘরে তার গোটা সংসার। নেওয়ারের খাট, তার পাশে লেখবার টেবিল চেয়ার। এক কোনায় রান্নার সরঞ্জাম, আর এক ধারে পূজার। কম্বলের আসন বিছিয়ে সনাতন চোখ বুঁজে আছে। ধ্যানমগ্ন নিবিষ্ট মন। কোন শব্দ তার কানে যাচ্ছে না।

মালতী খুব সহজ ভাবে ঘরে এসেছিল। কিন্তু সনাতনকে সমাধিস্থ দেখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। বোধহয় আর নিঃশ্বাসও নিচ্ছে না। কোন শব্দ করে সনাতনকে সে জাগাবে না।

আজ ভোরবেলায় ইলশে গুঁড়ির মতো বৃষ্টি হয়েছে। সিমলার পথ ভিজে। শীগ্র শুকোবে না। রোদ ওঠেনি, বোধহয় উঠবে না। আকাশের মেঘে আরও অনেক জল আছে। থেকে থেকে শির শির করে হাওয়া বইছে। সেই হাওয়ায় মালতীর শীত করেছে যত, তার চেয়ে বেশি ভাল লেগেছে। শুধু ক্লান্তি নয়, গায়ের জ্বালাও জুড়িয়েছে। ওভার কোট পরে মালতী পথে বেরিয়েছিল।

কোথায় যাবে সে গন্তব্য তার স্থির ছিল না। রিজের দিকে আসতে আসতে সেই কথা ভাবছিল। মনোহর চোপরার সম্বন্ধে তার মোহ ভঙ্গ হয়েছে। লোকটা বাহিরের কারবারে পটু হয়েছে—আদব কায়দা আর দেহের কারবার। অন্তরটা তার শূন্য। পরিচয় সেখানে ছায়াপাত করে না, সঙ্গ হয় না অন্তরঙ্গ। কয়েকটা দিন একসঙ্গে কাটিয়ে মালতী তার বন্ধু হয়েছে। হৃদয়ের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠবার অবকাশ পায়নি। ঈশ্বরের মতো হৃদয়টাকেও মনোহর অস্বীকার করে।

স্ক্যাণ্ডাল পয়েন্টে এসে সনাতনের কথা তার মনে পড়ল। এখানটায় তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। মালতী তখন তাকে চিনত না। তার বাবা প্রশ্ন করেছিল ঃ এখানে!

এখানেই থাকি।

বলে মাথার উপরের একটা খোলা জানালা সনাতন দেখিয়েছিল।

নিচের এই সব সাজানো দোকান পাটের উপরে যে মানুষ বসবাস করে, মালতীর তা জানা ছিল না। সেও আশ্চর্য হয়েছিল। তাই দেখে সনাতন বলেছিল ঃ নিচে থাকতে আমি ভালবাসি না। খাদের দিকে আঙুল দিয়ে লোকে বলবে, সনাতন এখানে থাকে। সে আমার অসহ্য।

তার কথার ধরনে মালতী হেসেছিল।

সনাতন বলেছিল ঃ অনেক খুঁজে এই ঘর পেয়েছি। এখন আকাশের দিকে চেয়ে সনাতনকে দেখতে হবে।

কথাটা মালতীর ভাল লেগেছিল। আকাশের দিকে চেয়ে আমরা সূর্যকে দেখি, দেখি চাঁদ আর তারা। আলোর জন্য জলের জন্য আমরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। দেবতাকে খুঁজি আকাশের উপরে। মাথা উঁচু করে আমরা বৃহৎকে দেখি, মহৎকে খুঁজি। কথাটা সনাতন বুঝিয়ে বলেনি, মালতীও হয়তো কিছুই ভাবেনি। তবু তার ভাল লেগেছিল। সেদিন লেগেছিল কিনা, মালতীর আজ তা মনে পড়ছে না। কিন্তু নিচে দিয়ে যাবার সময় সে উপরে তাকিয়েছিল। সনাতনের কথাটা তার মনে পড়ে গেল। ভাবল, বেশ বলেছিল কথাটা।

মালতী আর এগোল না। তার আরও একটি কথা মনে পড়ল। সেদিন এই লোকটাকে তাদের বাড়িতে সে দেখেছে। ড্রয়িংরুমে বসিয়ে তার বাবা মা তার সঙ্গে গল্প করছিলেন। চায়ের ফরমায়েশ

করেছিলেন। সেই চা না খেয়ে সনাতন চলে গেছে। মালতীর বাবা বলেছিলেন ঃ তেজ দেখ কেরাণীর!

তার মা বলেছিলেন ঃ তুমিই তো ডেকে আনলে!

মালতীর বাবা এ কথা সমর্থন করেন নি। কিন্তু মালতী বুঝেছে যে সনাতনকে তাঁর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কেন ছিল, সে কথা গোপন করেছেন।

আরও একটা প্রশ্ন মালতীর মনে এল। তার সম্বন্ধে অনেক কথা সনাতন জেনে গেছে। মনোহরের সঙ্গে যে কয়েকটা বন্য দিন কাটিয়ে এল, তা সে নিজের চোখেই দেখে গেল। জীপের ড্রাইভার তার পরিচিত, মনোহরের সঙ্গে আছে পরিচয়। সামান্য একটু কৌতূহল থাকলে সবই সে জেনে যাবে। এই সব ঘটনা এরা কী চোখে দেখে?

ভাল চোখে নিশ্চয়ই দেখে না। তাদের সমাজের গণ্ডি ছোট। ঐ ছোট গণ্ডির ভিতর এমন বড় স্বাধীনতার নিশ্চয়ই স্থান নেই। স্বৈরাচার বলে নিঃসন্দেহে নিন্দিত হবে। তবু মালতীর ইচ্ছা হল, সনাতনের কাছে এই কথাটা সে জেনে নেবে। এরা তার বিচারক নয়, এদের বিচারের কোন মূল্যও সে দেবে না। তবু একটা কৌতূহল। আর কিছু না।

সনাতনের অনাড়ম্বর পূজা শেষ হল। আসনটি গুটিয়ে রেখে পিছন ফিরে চমকে উঠল না। মালতী ভেবেছিল, সনাতন তাকে এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হবে, ব্যস্ত হবে। হয়তো খুশীও হবে। কিন্তু সনাতন শুধু প্রসন্ন মুখে বলল ঃ বসুন।

বলে চেয়ারটা এগিয়ে দিল।

একি একটা সম্বোধন হয়! যে রোজ আসে, দু বেলা আসে, সে এলেও বোধহয় এর চেয়ে ভাল অভ্যর্থনা পায়। মালতী বিরক্তভাবে বলল ঃ আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি। আপনি পোষাক পরুন।

সনাতনের পরনে ছিল গরদের ধুতি, আর খালি গায়ে একখানা গরম তুস। খানিকটা খসে পড়েছিল বলেই মালতী তার নিরাবরণ দেহ দেখতে পেয়েছে। ততক্ষণে সনাতন একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে তুসখানা জড়িয়ে নিয়েছে। হেসে বলল : এইবারে বসুন।

বলে টেবিলের নিচে থেকে একটা বেতের মোড়া বার করে খানিকটা তফাতে বসল।

মালতীও বসল। বলল : আপনাকে বোধহয় বিব্রত করলাম ?

কেন ?

এইতো, পুজোয় বিঘ্ন হল। এইবারে রান্নায় বাধা। আমার জন্যে আপনার অফিসের সময়তো পেছবে না !

না গেলেই বা ক্ষতি কি ?

সেকি, আমার জন্যে আপনি অফিস যাবেন না ?

আপনিই কি আমার জন্যে অনির্দিষ্ট সময় বসে থাকবেন ?

মালতী লজ্জা পেল।

সনাতন ঘরের কোনায় তার ইকমিক কুকার দেখাল। অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে, আর নিচের মেঝেয় একটু সাদা ছাই। বলল : আপনি নিশ্চিন্তে বসুন।

মালতী নিশ্চিন্তে বসতে পারল না। এবারে কী বলবে সেই চিন্তায় বিব্রত হল। সে নিজে এসেছে, কেন এসেছে তা বল দরকার। এমনি বেড়াতে এসেছে বললে সনাতন বিশ্বাস করবেনা। সামান্য মুখ চেনা সম্বল করে কোন মেয়ে আসে না পুরুষের কাছে। পুরুষ গেলেও তার কদর্থ হয়। মালতীর বড় অশ্বস্তি হচ্ছিল।

টেবিলের উপর থেকে সনাতন তার নস্যির কৌটো সংগ্রহ করল। এক টিপ নস্যি নিল চোখ বুঁজে। তারপর বলল : আপনি যে বেড়াতে বেরিয়েছেন, তা আমি বুঝেছি। একটু সহজ হয়ে বসুন।

মালতী বিস্ময়ে অভিভূত হল, বলল : কী করে জানলেন ?

তাহলে আর কী করতে আসবেন! বাবার বৈষয়িক কথা তো আপনি জানেন না!

বৈষয়িক কথা?

সে সব কথা থাক।

মালতী অপরিসীম লজ্জা পেল বলে মনে হল। পিতার এমন কী বৈষয়িক কাজ থাকতে পারে যার জন্য মেয়েকে পাঠানোর দরকার! কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস সে পেল না। কথাটা সত্য হতে পারে বলেই তার ভয় ছিল। তা না হলে তার পিতা মাতা একজন সাধারণ কেরাণীকে এনে ড্রয়িং রুমে বসতেন না। ব্যস্ত-ভাবে মালতী বলল: আজকের সকালটা বেশ শীতল, তাই না?

সনাতন হেসে বলল: আমাকে লজ্জা দেবেন না।

কেন?

চা কফির সরঞ্জাম আমার নেই। যদি বলেন, দোকান থেকে এনে দিতে পারি।

মালতী আবার লজ্জা পেল, বলল: আমিও ওসব ভালবাসি না।

আর কী আপনি ভালবাসেন না?

বড় অদ্ভুত প্রশ্ন। মালতী বলল: বিপদে ফেললেন। এত জিনিস ভালবাসি না যে তার লিস্ট মনে রাখা অসম্ভব।

সনাতন বলল: যা ভালবাসেন না, তা সহ্য করেন কেমন করে?

সব সময় সহ্য করি না তো?

অনেক সময় করেন। ভালবাসেন না, অথচ দেখান ভালবাসছেন।

মালতী তার প্রশ্নের দৃষ্টি সনাতনের মুখের উপর তুলে ধরল।

সনাতন বলল: এই দেখুন না, এই যে আপনি ঘুরে এলেন, এ কি আপনি ভালবাসেন, না আপনার ভাল লেগেছে?

আপনাকে এ কথা কে বলল?

ভাল লাগলে আপনার শরীর খারাপ হত না। 'শরীরের আগে মনটা আপনার খারাপ হয়েছে। তাই না?

মালতী উত্তর দিল না।

সনাতন বলল: জবাব দেওয়া যে আপনার পক্ষে কঠিন তা বুঝি। চুপ করে থাকলেই বুঝব যে মেনে নিচ্ছেন।

মালতী এ কথারও উত্তর দিল না।

সনাতন বলল: পৃথিবীর সকলকে ঠকান ক্ষতি নেই, কিন্তু নিজেকে কখনও ঠকাবেন না, আর ঠকাবেন না যাদের নিজের ভাবেন।

এ কথা কেন বলছেন?

বলছি এই কারণে যে সম্প্রতি আপনি ঠকে এসে আপশোস করছেন। ঠকিয়ে এলে এ দশা আপনার হত না।

আপনি কি জ্যোতিষ চর্চা করেন?

না।

তবে এ সব কথা কি আপনি শুনে বলছেন?

কথা আমি কান দিয়ে শুনি না, শুনি মন দিয়ে। আপনার মন আজ কাঁদছে। আপনার সমাজ আজ ভাল লাগছেনা। আপনি মুক্তি খুঁজছেন। মুক্তির আস্বাদ কোথায় পাবেন, সে কথা জানলে আমার কাছে আসতেন না। কিছু দিন আপনাকে অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াতে হবে।

অস্পষ্টভাবে মালতী বলল: কেন এমন হয় বলতে পারেন?

হৃদয় চর্চা কি আপনার ভাল লাগবে?

আপনি বলুন।

পশুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদটা তাহলে বুঝতে হয়। পশুর সমস্ত কাজ জৈব বোধে পরিচালিত। ক্ষুধা তার সবচেয়ে বড় বোধ। মানুষ তার শিক্ষা দিয়ে সংস্কার দিয়ে এই পশু প্রবৃত্তি দমন করে রেখেছে।

পেটের ক্ষুধার চেয়ে বড় তাড়না নেই, কিন্তু মানুষ অনশন করে মরতে জানে। তার দৃষ্টান্ত আছে। এই অভাবের দুর্ভিক্ষের দেশে ক্ষুধায় মানুষ মরছে, কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের পশু হবার দৃষ্টান্ত নেই! নিজের সন্তান সন্ততি তারা মেরে খায় না। বরং আত্মহত্যা করে।

মালতী শিহরে উঠল।

সনাতন বলল : এখুনি চমকাবেন না। খবরের কাগজে যে হত্যা ও নৃশংসতার সংবাদ পড়েন, সেও মানুষের কীর্তি। সে মানুষ অভাবগ্রস্ত ক্ষুধার্ত নয়, সে লোভী লালসালুব্ধ মোহগ্রস্ত মানুষ। পশুর সঙ্গে প্রভেদ তার ঘুচে গেছে, হৃদয় পরিণত হয়েছে দ্বিতীয় জঠরে। সে জঠরের অন্য খাদ্য—তার জন্য কামিনী কাঞ্চন চাই। আজ এই হৃদয়হীন দ্বিতীয় জঠর বিশিষ্ট মানুষেরাই পৃথিবীর সমাজ শাসন করছে।

মালতী ভয় পেয়েছিল। সনাতন সাহস দিয়ে বলল : ভয় পাবেন না। লোকে আমাকে পাগল ভাবে, বলে আমার সব কথাই ভুল। আমিও তাই প্রার্থনা করি। আমার বিশ্বাস যেন ভুল হয়, হে ভগবান, আমার অহংকারের চেয়ে মানুষ অনেক বড়, সে মানুষ যেন মানুষই থাকে।

অনেকক্ষণ পরে মালতী বলল : আপনি আমার কথা কী বলছিলেন ?

বলছিলুম আপনার কান্নার কথা। আপনি আজ কাঁদছেন।

কেন ?

সনাতন হাসল, বলল : রোমিও জুলিয়েটের গল্প পড়েছেন ?

ছবি দেখেছি।

ছবি ?

হ্যাঁ, সিনেমার ছবি।

সেক্সপীয়ারের রোমিও জুলিয়েট কি ?

তাই।

কতকটা আশ্বস্ত হয়ে সনাতন বলল: রোমিও জুলিয়েট পরস্পরকে দেখল দূর থেকে, মুগ্ধ হল, প্রেমে পড়ল। সে প্রেম হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় যোগের, দেহের মিলন নয়। মিলনের আগে তারা মরে গেলেও প্রেম তাদের অমর হয়ে থাকত, তাদের আত্মার তৃপ্তি বিরহেই সম্পূর্ণ হয়েছিল।

সনাতন বলে চলল: আমাদের গোঁড়া হিন্দুদের আগে বিবাহ হয়, পরে প্রেম। কিন্তু সংস্কার এই বিবাহকে শুধু দেহের মিলনে চরিতার্থ হতে দেয় না। হিন্দু বিবাহের প্রস্তুতি হয় পূর্বরাগের মতো রোমাঞ্চময়। বিবাহ আমরা বন্ধন ভাবি না, ভাবি জীবনের সম্পূর্ণতা। তাই শুভদৃষ্টির পূর্বেই আমাদের দুটো হৃদয় প্রফুল্ল শতদলের মতো উন্মুখ হয়ে থাকে—যদিদং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। হয়ও। জীবনে পশু প্রবৃত্তি বড় হয়ে না উঠলে আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ বড় একটা হয় না।

সনাতনের কথায় মালতী অভিভূত হয়েছিল। ধীরে ধীরে বলল: এ সব কি আপনার বিশ্বাসের কথা?

শুধু আমার নয়, ভারতের মানুষের পরম বিশ্বাসের কথা।

মালতী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

গুনগুন করে সনাতন আবৃত্তি করল:

তস্মৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদা
সর্বাংগানি সত্যমায়তনম্।
যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে
স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি॥

মালতী বলল: এ কী শোনাচ্ছেন?

কেনোপনিষদের শ্লোক।

এর মানে বলবেন না?

সংস্কৃতে আমি পণ্ডিত নই, বাঙলায় অনুবাদ পড়েছি। উপনিষদ শব্দের মানে হল অন্তর্নিহিত জ্ঞান। "সে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হল তপস্যা, দম ও কর্ম; বেদ তার সর্বাঙ্গ, সত্য তার আবাস স্থান। যে এই জ্ঞান বিদিত হয় তার কাছ থেকে পাপ বিদূরিত হয় এবং সেই বৃহত্তর লোকে এবং অনন্ত স্বর্গে সে তার প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সত্যই সে তার প্রতিষ্ঠা লাভ করে।"

সনাতন আচ্ছন্নের মতো কথা বলছিল। হঠাৎ যেন রেগে উঠল, বলল: ফিরে গিয়ে এই গল্প করবেন মনোহর চোপরার কাছে—সনাতন আপনাকে উপনিষদ শুনিয়েছে। সে আনন্দ পাবে।

তাকে আনন্দ দেবার দায়িত্ব তো আমার নয়!

কিন্তু সনাতন হঠাৎ নিষ্ঠুর হয়ে উঠল, বলল: চেষ্টার তো ত্রুটি করেন নি।

একটু আগে যে স্বপ্নময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, মুহূর্তে তা খানখান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। মালতী উঠে দাঁড়িয়ে বলল: এই আপনার সত্য-দর্শন?

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মালতী বলে গেল: ভেবেছিলাম, আপনার কাছে আবার আসব। সে দায় থেকে মুক্তি পেলাম।

সনাতন নিজেকে ধিক্কার দিল না। এই তার স্বভাব। মানুষকে আঘাত দিয়ে সে আনন্দ পায়। আর মানুষকে আনন্দ দেয় আত্মবিস্মৃত হয়ে। তবু সে মালতীকে অনুসরণ করে নিচে নেমে এল। মালতী তখন মানুষের ভিড়ে মিশে গেছে।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেই দেখতে পেল, শিস দিতে দিতে মনোহর আসছে ব্রিজের উপর থেকে। তাকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, বলল: ব্যাপার কী সনাতনবাবু, সকাল বেলাতেই এখানে এসে জুটেছেন?

বলে তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিল।

উপরের জানালা দেখিয়ে সনাতন বলল : গরিবখানা।

মনোহর আশ্চর্য হয়েছিল, কিন্তু তাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে সনাতন বলল : মিসেস সেন আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। আজ বিকেলে একবার যাবেন নাকি ?

কেউ তার খবর নিয়েছে শুনে মনোহর কৃতার্থ হল, বলল : ও সিওর।

সনাতন বলল : মালতী কাপুরকে সঙ্গে নেবেন। ওঁরা তাকে দেখেন নি। নিয়ে গেলে খুশী হবেন।

সার্টেন্‌লি।

শিস দিতে দিতে মনোহর এগিয়ে গেল।

সনাতন ভাবল, এ দিকে যাবার সময় এখনও আছে। সেন দম্পতিকে খবরটা কি দিয়ে আসবে। পোষাকটা তাহলে বদলে নেওয়া দরকার।

পঁচিশ

মায়াকে সমর সেন বসবার ঘরে টেনে আনল : অত সংসারী তোমার হতে হবে না।

সংসারী না হলে সংসার চলবে কী করে?

সে আমার ভাবনা, আজ তুমি গান গাও।

স্বামীর অনুরোধ শুনে মায়া হাসল।

হাসছ যে?

কাজ কর্ম সব পড়ে রইল, সোফায় বসে আমায় গান গাইতে হবে!

পিয়ানো থাকলে সোফায় বসাতুম না।

মায়া তার শাড়ির আঁচলের দিকে তাকাল। হাল্কা হলুদের দাগ লেগেছে এক জায়গায়। হাত দুখানা মুছে আসবারও অবকাশ পায়নি। কপালের চুল সরিয়ে বলল : কী গান গাইব বল।

যা মনে আসে।

মায়া বলল : তুমি আমায় বুড়ো হতে দেবে না।

তার পরেই গাইল :

আমি গাই
তোমার শেখানো গান।
আমি চাই
তোমার মতন প্রাণ।
বসন্তের ব্যাকুল বাতাসে
তোমার সৌরভ আসে

নাহি পাই

তোমার হাতের দান।

তবু গাই

তোমার শেখানো গান।

দরজার বাইরে পদধ্বনি শোনা গেল। এমন সময়ে তো কারও আসবার কথা নয়। মায়া উঠে পড়ছিল, সমর তাকে বসিয়ে দিয়ে বলল: গাও গাও।

কিন্তু গাওয়া আর হল না। দরজার উপর করাঘাত হয়েছে। বিরক্তভাবে সমর উঠে দাঁড়াল।

মায়া হেসে বলল: কেউ এলে খুশী হতে হয়।

বলেই সে ভিতরের ঘরে পালিয়ে গেল।

দরজা খুলে সমর আশ্চর্য হল: প্রিন্স!

তার পিছনেই দেখল মালতীকে। নমস্কার করে বলল: আসুন আসুন।

সমরের সঙ্গে করমর্দন করে মনোহর বলল: ডিস্টার্ব করলাম তো!

সমর হেসে বলল: খুব।

তারপর মালতীকে অভ্যার্থনা জানাল হাতের ভঙ্গিতে। দরজা বন্ধ করে মায়াকে ডাকল: কোথায় গেলে তুমি?

এইটুকু সময়ের ভিতরেই মায়া একটু পরিষ্কার হয়ে নিয়েছে। প্রসন্ন মুখে দুজনকেই নমস্কার করল।

মনোহর মায়াকে বলল: মালতীর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় নেই। আমার বন্ধু।

তারপরেই বোধহয় মনে পড়ল যে কাপুর দম্পতীর সঙ্গে এঁদের পরিচয় হয়েছে তাদের বাড়িতেই। তাড়াতাড়ি বলল: এঁর বাবা মাকে আপনারা দেখেছেন। মিস্টার ও মিসেস কাপুর।

মালতী শুধু নমস্কারের উত্তর দিল।

সমর বলল ঃ আমি তোমাদের বিকেল বেলায় আশা করেছিলুম।

তাহলে ফিরে যাই ?

তাড়াতাড়ি মায়া বলল ঃ এখন তো বন্দী করে ফেলেছি।

মনোহর বলল ঃ ভাবলাম বিকেলে এলে তোমাদের বেড়ানো বন্ধ হবে।

সমর বলল ঃ ভুল হল। বেড়াতে আমরা আসিনি, এসেছি সংসার করতে। দেখছনা মায়াকে! হাতা খুন্তি আর তার হাত থেকে নামছেনা।

মালতী আশ্চর্য হল, বলল ঃ আপনারা তো হোটেলে আছেন!

পরম কৌতুকে সমর বলল ঃ প্রিন্সকে জিজ্ঞাসা করবেন।

মনোহর বলল ঃ ওঁরা ভাল খাবার জন্যে নিজেরা রেঁধে খাচ্ছেন।

সমর বলল ঃ খরচ বাঁচাবার জন্যে বল।

মালতীর যে এ কথা বিশ্বাস হল না, তা তার চোখ দেখেই বোঝা গেল।

মনোহর ঘরের চারিদিকে কিছু খুঁজে দেখছিল।

সমর বলল ঃ কী খুঁজছ ?

মনোহর বলল ঃ বাইরে থেকে চমৎকার গান শুনছিলাম।

সমর হাসল, কিন্তু মায়ার মুখ গেল শুকিয়ে।

মালতী কিছু লক্ষ্য করেছিল। বলল ঃ আপনি গান গাইছিলেন বুঝি ?

স্বীকার করার সাহস মায়ার ছিল না, মিথ্যে কথাও বলতে পারলনা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল ঃ একটু চা খান।

সমর বলল ঃ এবারে আমার পালা।

ভ্রূভঙ্গে মায়া তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু সমর থামল না, বলল : তুমি বস, আমি তোমাদের চা করে খাওয়াব।

জোর করে মায়া যেতে পারত, কিন্তু গেল না। অতিথিদের কাছেও একজনের থাকা দরকার, আর কুরুক্ষেত্র বাধালে বড় শোভন হবে না। বলল : আপনিই বলুন, বিলেতে এই কি নিয়ম ছিল?

ব্যাপারটা মনোহর বুঝতে পারেনি। বলল : কী নিয়ম বলছেন?

এই দেখছেন না, আমি বসে রইলাম আর ও আপনাদের চা করে খাওয়াবে!

মনোহর শহরের হোটেলেই তার বিলেতের জীবনটা কাটিয়েছে। ক্বচিৎ কদাচিৎ থেকেছে গ্রামে কারও পেয়িং গেস্ট হিসাবে। পয়সার অভাব খুব তীব্র না হলে সে গ্রামে যেত না। তখন নিজের ভাগ্য আর পিতার বুদ্ধিকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কিছু সে করত না। এ সব পারিবারিক ব্যাপার দেখবার সে কোন সুযোগই পায়নি। বলল : আই সি।

মায়া আরও বুঝিয়ে বলল : ছুটির দিনে মেম সাহেবরা নাকি শুয়ে থাকে, আর সাহেবরা করে ঘরকন্নার কাজ। সত্যি কথা?

ও ধারের ঘর থেকে সমর বলল : সত্যি কথা বল প্রিন্স, না জানলে স্বীকার কর।

মায়া বলল : আপনি নির্ভয়ে বলুন। এসে অবধি আমাকে জ্বালাতন করে খাচ্ছে।

মনোহর লজ্জিত ভাবে স্বীকার করল : জানিনে।

চায়ের জল চড়িয়ে সমর ফিরে এসেছিল, বলল : আমাদের বেড়ানোর সমস্যা সরল হয়ে গেছে। সামনের পুজোয় কাশ্মীর যাবার কথা। ঠিক করেছি, ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে দেওয়ালে একখানা

কাশ্মীরের ছবি টাঙিয়ে দেব। আর সেই দিকে চেয়ে ভাবব, কাশ্মীরে আছি।

মনোহর অট্টহাস্য করে উঠল। মায়া লজ্জা পেয়ে বলল ঃ আমি বুঝি তাই করছি!

মায়ার লজ্জা দেখে সমর খুশী হল। বলল ঃ বল এবারে, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।

কিন্তু মায়া তা বলল না, বলল ঃ আমরা বড় অসামাজিক হয়ে যাচ্ছি। যাঁরা বেড়াতে এলেন তাঁদের কথা না শুনে আমরা নিজেদের কথাই অনর্গল বলে যাচ্ছি।

সমরও সামলে নিল। বলল ঃ অনেক দিন প্রিন্সের দেখা পাইনি।

বাইরে গিয়েছিলাম।

বাইরে?

মালতীর দিকে চেয়ে মনোহর বলল ঃ সিমলার রূপ দেখে এলাম।

একটু খুলে বল।

মাশোব্রা নালদেরা তত্তাপানি। রিজ থেকে মাশোব্রা মাত্র ছ মাইল। হেঁটেই পৌঁছনো যায়। আর নালদেরা সেখান থেকে মাইল পাঁচেক।

মায়া আস্তে আস্তে বলল ঃ দেখলে তো!

সমর বলল ঃ তারপর?

মনোহর প্রশ্ন করল ঃ কী নাম সেই জায়গাটার মালতী? আমরা নৌকোয় উঠলাম?

ছাবা।

রোমান্টিক জায়গা। তত্তাপানি যাবার পথে আমরা থেমেছিলাম। সিমলার বিদ্যুৎ নাকি আসে—চাঁদের আলোয় আমরা—

বাধা দিয়ে মালতী বলল: বিলেতে অমন জায়গা তো আপনি ঢের দেখেছেন।

মনোহর সমরের দিকে চেয়ে রহস্যময় হাসি হাসল।

সমর বুঝতে পারল যে মালতী তার নিজের প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল। বলল: আপনি বুঝি বিলেতে যান নি?

না।

ভাল করেছেন।

কেন?

দু দিনের জন্যে বেড়াতে গিয়ে আমরা শুধু বাইরেটা দেখে ফিরে আসি। ভিতর দেখবার অধিকার কজনে পাই! যে দেশের লোক পৃথিবী শাসন করল কয়েক শো বছর ধরে, তাদের একটা গুণও আমরা সঙ্গে আনিনা। যা আনি, তা তাদের বন্যতা।

সমরকে মায়া বাধা দিল: সভ্যতাও তো আনি।

সমর উত্তর দিল না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মনোহর বলল: তোমার এই দার্শনিক মনোভাবের জন্যে সে দেশে তুমি বিদেশী রয়ে গেলে।

মালতী তার ঘরের চারিদিকে একবার চেয়ে দেখল। বলল: আপনি উপনিষদ পড়েন?

সমর হেসে বলল: না।

কেন পড়েন না?

মানে বুঝি না বলে।

সকলেই কি মানে বোঝে না?

তা কী করে বলি! কিন্তু যাঁরা বোঝেন, তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি।

মনোহর বলে উঠল: উপনিষদ! হ্যাঁ হ্যাঁ, স্মিতার বাবার মুখে ঐ রকম একটা নাম শুনেছিলাম মনে হচ্ছে।

সমর বলল ঃ তা হবে। বুড়ো মানুষ, অবসর নিয়েছেন। ঐ সবই পড়বেন তো।

সেই সঙ্গেই যোগ করল ঃ আমার বাবা কিন্তু অল্প বয়সেই পড়েছিলেন, এখনও পড়েন।

সনাতনের কথা মালতীর মনে পড়েছিল। উপনিষদের নাম সে তার মুখেই শুনেছে। ভাল লেগেছে তার আবৃত্তি, কী খারাপ লেগেছে, তা এখন মনে করতে পারছেনা। শুধু মনে পড়ছে যে তার একটা কথায় সে অপমানিত বোধ করেছিল। কিন্তু কথাটা সত্য। সনাতন মিথ্যা বলেনি। মিথ্যা হলে তার অপমান বোধ হত না। সত্য অপ্রিয়, সত্য নিষ্ঠুর, সত্য মর্মান্তিক। তাই লোকে সত্য কথা কম বলে।

মায়া কখন উঠে গিয়েছিল, সমর খেয়াল করেনি। চায়ের পেয়ালা হাতে পেয়ে চমকে উঠল। বলল ঃ তুমি চুক্তি ভঙ্গ করলে!

লোকে কথা রাখে না বলেই তো চুক্তির দরকার। ভাঙো, আবার নতুন চুক্তি কর।

মনোহর উল্লসিত হল ঃ একজ্যাক্টলি সো। আমার চুক্তি আমি রোজ ভাঙি।

সমর বলল ঃ মায়ার কথায় আর কাজে একেবারে মিল নেই। একটা বাঁধানো খাতায় লুকিয়ে লুকিয়ে কী লিখে রাখে। আর প্রয়োজন মতো ভয় দেখায়। সেদিন কী বলেছিলে! সেদিনের কথা কি আমার মনে আছে? কিন্তু মায়ার খাতায় আছে লেখা।

হাসতে হাসতে মায়া বলল ঃ হিন্দু কোড বিল পাশ হয়ে অবধি ভয় দেখাচ্ছে। আমাকেও তো সাবধান হতে হবে। কী বলেন?

মনোহর কিছু বুঝল না।

তাই দেখে মায়া বলল : মামলা দায়ের করলেই খাতাখানা ফেলে দেব। পড়ে দেখুক। ভয় যদি না পায় তো চালাক মামলা। ওর উকিলের সঙ্গে আমার খাতা লড়বে।

এক সঙ্গে সবাই হেসে উঠল।

সমর আস্তে আস্তে বলল : আবার আমরা নিজেদের গল্প শুরু করেছি কিন্তু।

মায়া লজ্জা পেয়ে বলল : সারা দিন আমরা নিজেদের নিয়েই আছি কিনা! আমরা চলে গেলে আপনারা রক্ষা পাবেন।

মনোহর বলল : আপনারা কি চলে যাচ্ছেন ?

বিষন্ন ভাবে সমর বলল : না গিয়ে আর উপায় নেই। রবিবার আমার ছুটির শেষ।

মায়া মালতীকে জিজ্ঞাসা করল : আপনি কিছু দিন থাকবেন তো ?

মালতী বলল : জানিনে।

মায়া মনোহরের দিকে চেয়ে হাসল। যেন সে বুঝেছে যে মালতীর ফিরে যাওয়া নির্ভর করছে মনোহরের ইচ্ছার উপর। সমর তাই মনোহরকে জিজ্ঞাসা করল : তোমার মৎলবটা কী ?

মনোহর উত্তর দিল : ভাল লাগছে না।

সে কি ?

সত্যিই ভাল লাগছে না।

সমর তাকে আশ্বাস দিল : দিল্লী ভাল লাগবে।

মনোহর এখনও বুঝতে পারেনি, মায়া কেন তাদের ডেকেছে। বারে বারে সে তার দিকে তাকাতে লাগল। মায়া একটু জড়োসড়ো হয়ে বসল।

মালতী বলল : আপনারা বুঝি দিল্লীতে থাকেন ?

নয়া দিল্লীতে।

কখন দেখিনি তো ?

মায়া বলল ঃ কোথাও যাইনে যে।

সে কি! মালতী আশ্চর্য হল, সমরকে বলল ঃ বিলেতে আপনি কত দিন ছিলেন?

বছর দুই।

আপনার বিলেতের অ্যালবাম আছে?

না তো। চাকরি করে লেখাপড়া করেছি, ছবি তোলবার সময় কোথায়!

তারপরেই তার মনে পড়ল ঃ আছে আছে, মায়ার কাছে একখানা ছবি আছে। আমার নিজের ছবি। স্টুডিওতে তুলে ওর কাছে পাঠিয়েছিলুম।

বিলেতের স্যুভেনির আর কী আছে?

স্যুভেনির! কই সে সব তো সংগ্রহ করিনি! তোমার জন্যে কিছু এনেছিলুম যেন।

বলে মায়ার দিকে তাকাল।

নাচতে জানেন?

না।

গান?

মায়া জানে।

সে তো বাঙলা গান।

মালতীকে নিয়ে মনোহর যখন চলে গেল, সমর বলল ঃ তোমার গানটা এবারে শেষ কর।

মায়া বলল ঃ মালতীকে কেমন লাগল?

ভাল।

মেয়েটা আমাদের মতোই, তাই না?

জানিনে। তুমি গান শোনাও।

মায়া গাইল ঃ

ফুল হয়ে ফোটে বেদনার দল
কান্নায় হয় সাধনা সফল।
শ্রাবণের আকুল ধারায়
তোমার চিহ্ন মুছে যায়।
আমি পাই
অন্তরে সন্ধান।
আমি গাই
জয় যুক্ত জীবনের গান।

ছাব্বিশ

সনাতন তার ঘরের জানালার নিচে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসেছে। সিমলার সদর রাস্তায় অন্ধকার ঘন হতে পারেনি। বিদ্যুতের আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। পথচারীর নিরন্তর আনাগোনা। সনাতন তার নিজের ঘরের বাতি জ্বালেনি। অন্ধকারে বসে চলমান জগৎটাকে দেখছে। আর ভাবছে।

ভাবনার শুরু নেই, শেষ নেই, অনেক সময় সঙ্গতিও নেই। তবু সনাতন আজ ভাবতে বসেছে। অনেক দিন সে নিরিবিলি বসে ভাবেনি। ভাববার অবসর ছিল না। ঘটনার প্রবাহে তার চিন্তা ব্যাহত হয়েছে।

সনাতন নবদ্বীপের গোস্বামী, ভট্টপল্লীতে তার মাতুলালয়। শৈশবের একটি ঘটনা তার মনে পড়ছে। তার দাদামশায় একদিন বলেছিলেনঃ তোর সনাতন নাম কেন রেখেছি জানিস?

সনাতন বলেছিলঃ জানি। কোন দিন আমাকে আধুনিক হতে দেবে না। যুগের হাওয়ায় আধুনিক হবার চেষ্টা করলে ঐ নাম আমাকে উপহাস করবে।

দাদামশায় পিঠ থাবড়ে বলেছিলেনঃ সাবাস দাদা, এই বয়সেই তুই বুদ্ধ হয়েছিস দেখছি।

বয়সের চেয়ে সনাতন বুড়ো ছিল বেশি। কথা বলত পাকা পাকা, পড়শিরা বলতেন, এঁচোড়ে পাকা। বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সহ্য করতেন। ছেলে পড়াশুনোয় ভাল, দোষ করে মিথ্যা বলেনা, প্রতিবাদ করে অন্যায় দেখে। তখন সে নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক অত্যাচারেও তার চোখের আগুণ নেবে না।

উত্তরের খানিকটা বাকি আছে। মালতা অপেক্ষা করতে লাগল।

সনাতন বলল : কাল আমি আপনার কান্না শুনেছি। আপনি কাঁদবার জন্য বেরিয়েছিলেন। পারিচিত কাউকে খুঁজে না পেয়ে আপনি আমার কাছে এসেছিলেন। আমি আপনার শূন্য মনের বিলাপ শুনেছি। শুনিনি কি?

মালতী উত্তর দিল না।

কিন্তু সনাতন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল। ছিছি, এ কোন্ চর্চা সে শুরু করেছে! তার জন্য তো দুর্বলতা নয়! তাড়াতাড়ি বলে উঠল : আপনি সেলাই জানেন?

বিস্মিত মালতী চাইল মুখ তুলে।

সনাতন বলল : আমার টুপিটা ছিঁড়ে গেছে। ব্যালাক্লাভা ক্যাপ। বাঙলায় বাঁদরের টুপি।

মালতী বুঝতে পেরেছে। বলল : সুতো আছে তো?

আছে।

দেওয়ালের একটা হুক্ থেকে তার ওভার কোট ঝুলছিল। টুপিটা তারই উপর। সনাতন সেটা নামাল, বেতের একটা ঝুড়িও দিল এগিয়ে। তার ভিতরে ছুঁচ সুতো। উল নেই। মালতী হেসে বলল : উলের টুপি কি সুতো দিয়ে সেলাই হয়?

কেন হবেনা! মালতী যদি সনাতনের কাছে আসতে পারে—

বাধা দিয়ে মালতী বলল : বুঝেছি।

তবে আমার নস্যির কৌটোটা এগিয়ে দিন।

মালতী এগিয়ে দিল, তারপর ছুঁচে সুতো পরাল।

বিশ্বের ভাণ্ডারে বুঝি বিস্ময়ের শেষ নেই। যদি থাকত তো জীবন এমন বিচিত্র হত না, এমন অভাবনীয়। এক টিপ নস্যি আঙুলে চেপে সনাতন এই কথাই ভাবছিল।

মালতী বলল : রাতে আপনি কী খান ?

দুধ আর ফল।

আর কিছু না ?

ক্ষিধে বেশি পেলে রান্না করি।

মালতী মনোযোগ দিয়ে সেলাই করছে। আর সনাতন চোখ বন্ধ করে নস্যি নিচ্ছে। স্মিতাকে নিয়ে বিধায়ক যে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, কেউই দেখতে পায়নি। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে বিধায়ক তাদের চমকে দিলনা, বাইর থেকে শব্দ করে জাগিয়ে দিল।

সনাতন লাফিয়ে উঠল : আরে আরে, বাইরে কেন! ভেতরে এস।

স্মিতার মুখোমুখি দাঁড়াল মালতী।

সনাতন হেসে বলল : পরিচয় নেই তো! স্মিতা আর বিধায়ক আমার বন্ধু, মালতী। সামনের অগ্রানে এদের বিয়ে হবে।

মালতী কাপুরকে স্মিতা চিনতে পরাছেনা। এতো তারই মতো একটি মেয়ে, একটু বেশি ফর্সা আর বেশি সুন্দর। সাধারণ একখানা শাড়ির উপর কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে এসেছে। মুখে রঙ নেই, নেই কোন গৌরবের অহংকার। এ কোন্ মালতী কাপুর ?

স্মিতার মুখের দিকে তাকিয়ে সনাতন হাসল।

ঘরে অতিরিক্ত আসবাব নেই একটিও। কে কোথায় বসবে ভেবে পাচ্ছিল না। মালতী খাটে বসে সনাতনকে তার পাশে বসাল। স্মিতা বসল মালতীর মোড়াটায়। বিধায়ক চেয়ারে বসে কথা কইল : আমাকে সেদিন ঠকালে কেন ?

তোমাকে আবার কবে ঠকালুম ?

সারাটা সন্ধ্যে আমায় প্রস্পেট হিলের নিচে প্যারেড করালে!

সনাতনের দু চোখে কৌতুক ঝলসে উঠল। বলল : তাতে কি ঠকেছ তোমরা ?

এই মুহূর্তে স্মিতার মনে হল, সনাতন সবই জানে, এ সমস্ত তারই কাণ্ড। লজ্জায় তার মাথা নত হয়ে গেল।

সনাতন বলল: সেদিন যখন অ্যানানডেলের গল্প বলেছিলুম, বন্ধু, আমার ওপর রাগ করেছিলে। আজ কিছু বল।

বিধায়ক স্মিতাকে বলল: সনাতনের কথা তোমাকে বলিনি। বলেছিল, তুমি নাকি অ্যানানডেলের ময়দানে দাঁড়িয়ে সিমলার সমাজটা দেখছিলে। উঠে একবার দেখে আসা ভাল। পা যদি না ফস্কায়, তুমি সুখী হতে পারবে।

স্মিতা সনাতনকে বলল: আজ একটা সত্যি কথা বলবেন?

আমার কোন কথা কি মিথ্যা বলে সন্দেহ হয়?

না। মিথ্যা অত কটু হয়না।

সনাতন হাসল।

স্মিতা বলল: সেদিন চোপরা সাহেবের বাড়িতে আমাদের গানের নিমন্ত্রণটা কি আপনার পরামর্শেই হয়েছিল?

সনাতন হেসে বলল: ওঁরা চলে যাচ্ছেন। মনোহর বোধহয় চাকরি পাবে।

স্মিতা ও মালতী দুজনেই সনাতনের মুখের দিকে তাকাল।

আজ বিধায়ক ক্ষেপে উঠল। পাবে বৈকি, ওরা চাকরি না পেলে দেশের সরকার চলবে কী করে!

সনাতন হেসে উঠল। অকপট প্রসন্ন হাসি। তার মুখের কোনখানে আজ ভ্রূকুটির লেশ নেই, কণ্ঠে নেই তিক্ততা। বলল: অন্যের দোষ দেখতে নেই বিধায়ক।

বিধায়ক একাই আশ্চর্য হল না, স্মিতাও হল। এই কি তাদের সনাতন!

সনাতন বলল: ভুল তারই ধর, যাকে ভাল করতে পারবে। তাই না মালতী?

মালতী নিবিষ্ট মনে টুপি সেলাই করছে। মুখ তুলল না। তার মুখেও প্রসন্ন হাসি লেগে আছে।

স্মিতার দৃষ্টি পড়ল দেওয়ালের উপর। হুক থেকে একটা ওভার কোট ঝুলছে। ওটা যেন চেনা চেনা। সনাতনকে তো গায়ে দিতে দেখেনা, কাকে দেখেছে তাহলে ?

পরম কৌতুকে সনাতন বলে উঠল : টুপিটা লুকোওনি মালতী, এরা যে নানা কথা সন্দেহ করবে !

তাইতো, এ ওভারকোট আর ঐ টুপি। স্মিতার আর সন্দেহ রইল না। কিন্তু মালতীর হাতে টুপি দেখে নতুন সন্দেহ এল মনে।

বিধায়ক বলল : আপনি এখন সিমলাতেই থাকবেন তো ?

মালতী বলল : তাই ভাবছি। শীতের সিমলা অনেক দিন দেখিনি, দেখব বসন্তও।

খোলা জানালা দিয়ে অল্প অল্প বাতাস আসছে। শীতের বাতাসের মতো শীতার্ত নয়, হেমন্তের স্পর্শে আছে বসন্তের রোমাঞ্চ !

নাকে নস্যি গুঁজে পৃথিবীকে ভেংচি কাটতে সনাতন ভুলে গেল। সে হাসছে।

সমাপ্ত